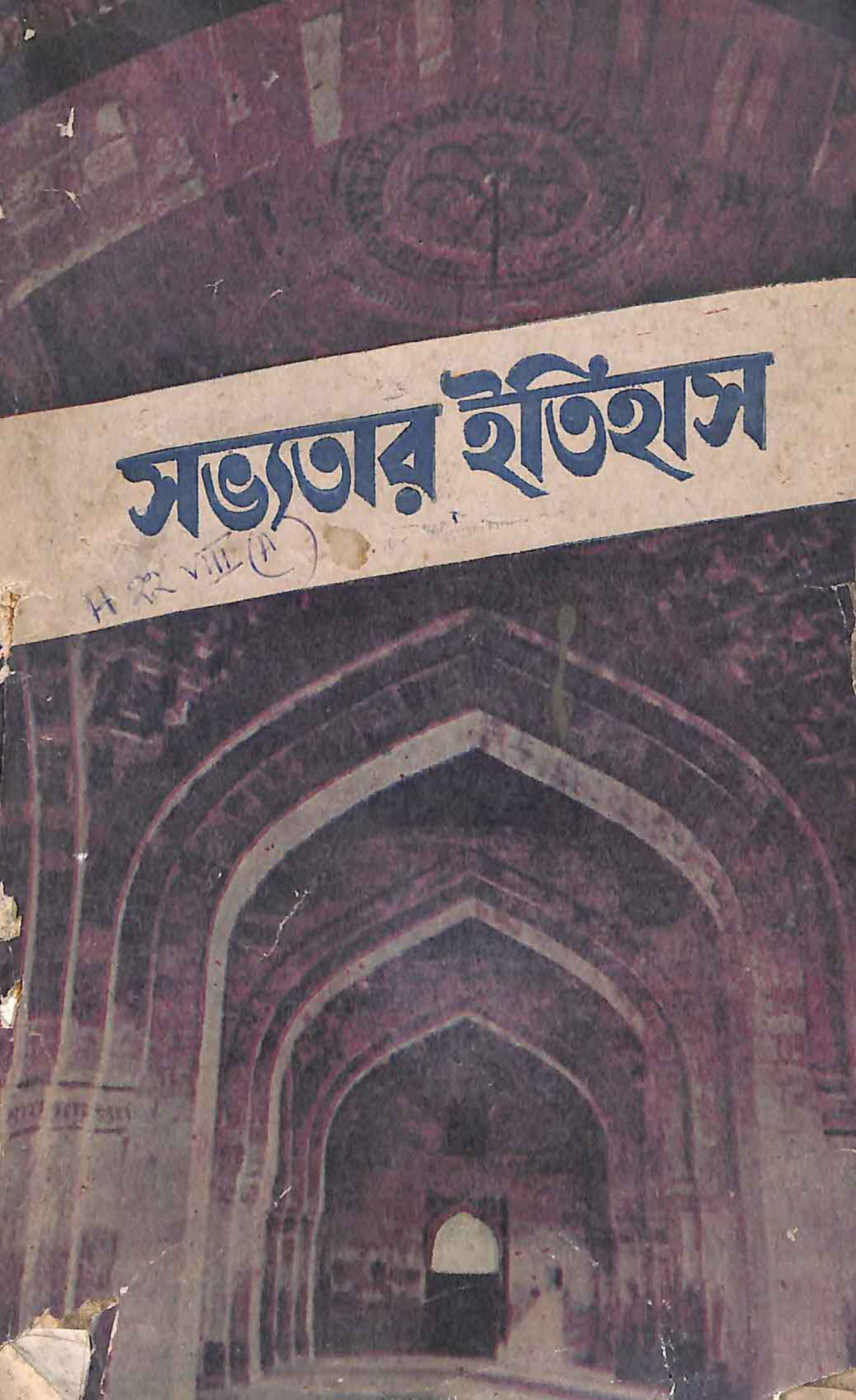
# সভ্যতার ইতিহাস



[Written according to the New Syllabus For 1982 by the Board of Secondary Education, West Bengal as a Text Book of History for class VIII of all High and Junior High Schools of West Bengal and Tripura.]

# সভ্যতার ইতিহাস
## [আধুনিক যুগ]

(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

ড. সোমেন্দ্রলাল রায়, এম.এ.ট্রিপ্‌ল, পি-এইচ.ডি.
ইতিহাস বিভাগের প্রধান, বোলপুর কলেজ।
('এ সর্ট হিষ্ট্রি অফ দি মিড্‌ল ইষ্ট', 'এ সর্ট হিষ্ট্রি অফ দি ফার ইষ্ট', 'জাহাঙ্গীর নামা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।)
ও
অধ্যাপক অজয় গুপ্ত, এম.এ.
প্রধান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কাটোয়া কলেজ।



: প্রাপ্তিস্থান :

সঞ্চিতা বুক ষ্টল
ষ্টল নং-৭৩
বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

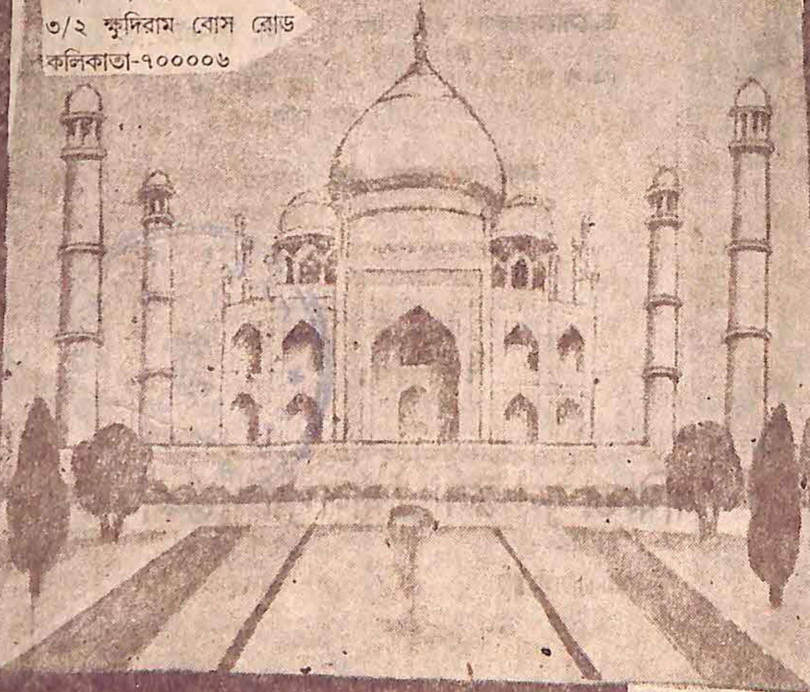
বোলপুর পুস্তকালয়
বোলপুর
বীরভূম

প্রকাশক ঃ
এন, পাবলিশিং কনসার্ণ
২২/এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯


সংশোধিত সংস্করণ—ডিসেম্বর, ১৯৮১
পরিমার্জিত সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৮৬
পরিমার্জিত সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৮৭



মুদ্রাকর ঃ
এম, এম, ট্রেভার্স
৩/২ ক্ষুদিরাম বোস রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬



# সূচীপত্র

# সভ্যতার ইতিহাস

## প্রথম অধ্যায়

## আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগের কাল নির্ণয় : ঐতিহাসিকরা মোটামুটি ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন যে মধ্যযুগের অবসানকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলা হয়ে থাকে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের হাতে কনষ্টান্টিনোপলের পতনের পরই আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। এই পতনের ফলে আমরা ধরে নিয়ে থাকি সামন্তবাদের গর্ভে যে বণিক সভ্যতার উন্মেষ ছিল তারই বিস্ফোরণ।

এই বণিক সভ্যতাকে বলা হয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। এই যুগের পরিবর্তন কিন্তু একদিনে হয় নি। দীর্ঘ বছর ধরে আস্তে আস্তে এই পরিবর্তন হতে থাকে। আবার পৃথিবীর সব দেশেই এই পরিবর্তন হয় নি। ইউরোপে যত দ্রুত এই আধুনিক যুগের পরিবর্তন হয়েছে এশিয়া বা আফ্রিকাতে কিন্তু আধুনিক যুগ এসেছে অনেক পরে। আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। আবার রেলপথ ও ছাপাখানা হচ্ছে আধুনিক যুগের প্রধান লক্ষণ।

ইউরোপে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আধুনিক যুগ প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং আধুনিক যুগ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী যখন ধূলায় অবলুণ্ঠিত, সেই সময় ভারতে আধুনিক যুগ বা রেনেসাঁ জন্মলাভ করেছে।

সামন্তবাদের অবক্ষয় : মধ্যযুগে ভূমি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাকেই বলা হতো সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা। ইউরোপে এই ব্যবস্থায় কৃষকদের দাস করে রাখা হতো। ভারতের মধ্য যুগের সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু ইউরোপীয় সামন্তবাদের মতন ছিল না। এখানকার সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল কিছু

পরিমানে যজমানী প্রথা। ভারতের সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যে উৎপাদন ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়, তাকে অনেকটা 'যজমানী হক' বলা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, সামন্তবাদের গর্ভ থেকেই বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। তাই ইউরোপে দেখা যায় বণিক শ্রেণী যখন ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে এবং ভূমিদাস যখন স্বাধীন কৃষক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় তখনই সামন্তবাদের সঙ্গে বণিক তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। এই দ্বন্দ্বে সামন্তবাদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে যায়।

**আধুনিক যুগের লক্ষণ ঃ** ঐতিহাসিক পরিবর্তনের গতিপথে সামন্তবাদ অনিবার্যভাবে যখন লোপ পায় এবং ঐতিহাসিক কারণে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের অভ্যুদয় হয় সেই সময়কে আধুনিক যুগ বলে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেন। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন যুক্তি, দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসার ঘটে তেমনি অন্যান্য লক্ষণ-গুলির মধ্যে প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যন্ত্রশিল্পের বিকাশ। সামন্ত ভূস্বামিদের পরিবর্তে শিল্প মালিকরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। ভূমি-দাসদের বদলে স্বাধীন কৃষক ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, সাথে সাথে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়। নগর সভ্যতার উন্মেষের ফলে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা শিথিল হয়ে বিজ্ঞানের উন্নতি ও জগৎ সম্পর্কে বাস্তবের আলো প্রবেশ করে।

**ইউরোপীয় পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ঃ** ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে আধুনিক যুগের প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায় ইউরোপীয় অর্থনীতিতে। এই যুগে সামন্তবাদের অবক্ষয় ইউরোপীয় অর্থনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। মধ্যযুগের সামন্ত রাজা-মহারাজাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। সামন্ততন্ত্রের ভূমিদাস শোষণ ও অত্যাচারে প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বে ইউরোপের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন নতুন

দেশ আবিস্কারের ফলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বাণিজ্যের তাগিদে ইউরোপের দেশসমূহ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। ইউরোপীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে।

**কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঃ** সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষিক্ষেত্রে নূতন ধরনের চাষ ও শিল্পের উপযোগী নানা ফসলের উৎপাদন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হয়। সামন্তযুগীয় অর্থনীতিকে বিলোপ করে নতুন অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর মধ্যে যন্ত্রের প্রভাব এসে উপস্থিত হয়।

প্রভাব ঃ আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বে এই সকল পরিবর্তনের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। মধ্যযুগীয় সামন্ত ব্যবস্থায় যে অবক্ষয় এসেছিল তাতে করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় রাজশক্তি। বণিক, মহাজনেরা এক শক্তিশালী শ্রেণীরূপে সমাজে এসে উপস্থিত হয়। এদের বাণিজ্য পুঁজিই পরবর্তি কালে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। সামন্তশ্রেণীতে যে ভূমিদাস প্রথা দেখা যায়, পরবর্তিকালে এই ভূমিদাসের একটা বিরাট অংশ শ্রমিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ আধুনিক যুগে দুটো শ্রেণী তৈরী হয়। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাদের বলা হয়—বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সর্বহারা শ্রেণী।

**শিল্পোৎপাদনে পরিবর্তন ঃ** পরিবর্তনের ঢেউ শিল্পোৎপাদন প্রণালী মধ্যেও দেখা দেয়। মধ্যযুগে সাধারণত করিগরেরা সম্পূর্ণ দ্রব্যটি উৎপাদন করে প্রত্যক্ষভাবে ক্রেতাকে বিক্রী করত। বাণিজ্য প্রসারের ফলে বণিকেরাই কারিগরের কাছ থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে তা বিক্রী করত। শ্রম বিভাগ সাধারণত প্রচলিত ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বে উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়। বাণিজ্যের প্রসার পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে পশম, রেশম ও সুতী বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অধিক উৎপাদনের প্রয়োজনে স্থাপিত হয় ছোট ছোট কারখানা। সেখানে প্রবর্তিত হয় শ্রমবিভাগ নীতি। উৎপাদিত দ্রব্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন লোক উৎপাদন করত।

প্রভাব ঃ আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বে এই সকল পরিবর্তনের তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমতঃ, এই সময় মধ্যযুগীয় সামন্ত-ব্যবস্থার অবক্ষয় দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্থাপিত হয় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজশক্তি। তৃতীয়তঃ, বণিক-মহাজনেরা একটি শক্তিশালী নূতন শ্রেণীরূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। এদের হাতে সঞ্চিত হতে থাকে বাণিজ্য-পুঁজি। বুর্জোয়া বলতে এই শ্রেণীকেই বোঝায়। চতুর্থতঃ, সার্ফ বা ভূমিদাস এবং ছোট ছোট চাষীদের ক্রমানুলুপ্তির ফলে কৃষি ব্যবস্থায়ও দেখা দেয় পরিবর্তন। অনুসৃত হয় উন্নত ধরনের কৃষি ব্যবস্থা। বিতাড়িত চাষীরা জীবিকার জন্য ক্রমে মজুরি-ভোগী শ্রমিকে পরিণত হয়। পঞ্চমতঃ, বাণিজ্য বিস্তার এবং পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির পবিবর্তন ঘটে এবং মজুরিভোগী শ্রমিকের উৎপত্তি হয়। ষষ্ঠতঃ, এই সকল পরিবর্তনের ফলে সাংস্কৃতিক জীবনে রূপান্তর দেখা দেয়।

এইভাবে অর্থনৈতিক ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ইউরোপের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা রূপান্তর ঘটায়।

## অনুশীলনী

১। সাধারণ প্রশ্ন ঃ

(ক) আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বে ইউরোপে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়? এই পরিবর্তনের তাৎপর্য ও প্রভাবগুলি কি কি?

(খ) সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে লোপ পায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(গ) আধুনিক যুগের কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের রূপটি কি ভাবে হয়?

(ঘ) সামন্তপ্রথার বিলোপের পর শিল্পের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থাটির পরিবর্তনের প্রধান লক্ষণ কি ?

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**

(ক) ইউরোপে আধুনিক যুগের শুরু হয় কখন এবং কোন শতকে ?

(খ) সামন্ততন্ত্র কিসের ওপর নির্ভরশীল ছিল ?

(গ) মধ্যযুগে রাজার ক্ষমতা কেমন ছিল ?

**৩। সঠিক উত্তরটির পাশে দাগ দাও ঃ**

(ক) আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বে ইউরোপে সামন্ত প্রথার উদ্ভব/অবক্ষয় হয়।

(খ) আধুনিক যুগে উত্তরণ পর্বে উৎপাদন পদ্ধতিতে বিনিময় প্রথার/শ্রমবিভাগ প্রথার পরিবর্তন হয়।

(গ) মধ্যযুগে ভূমি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠেছিল তাকেই বলা হতো সামন্তবাদী/বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা।

(ঘ) সামন্ত ভূস্বামিদের পরিবর্তে শিল্প মালিকরা/কৃষকরা সামাজিক ও রাষ্ট্রী ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

**৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ**

(ক) সামন্তবাদের—থেকেই—শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

(খ) যুগের—সবচেয়ে বেশী দেখা যায়—অর্থনীতিতে।

(গ) কৃষিক্ষেত্রে—ধরনের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ—হয়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
# ইউরোপের নবজাগরণ

**নবজাগরণের সঠিক সংজ্ঞা ঃ** যে কোন নতুন ধরনের জাগরণকে বা নতুন কিছু আন্দোলন করাকেই নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলা যায় না। পৃথিবীর বহুদেশে বা ভারতবর্ষে এমন অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা বা আন্দোলন হয়েছে যাকে নবজাগরণ বলা যেতে পারে না। যেমন, আমাদের ভারতবর্ষে সম্রাট অশোক বা মহামতি আকবর বা ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী যুগকেও আমরা নবজাগরণ বলতে পারি না।

নবজাগরণ বলতে তাকেই আমরা বলব, যে আন্দোলন বা চিন্তা-ধারা সামন্তবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তার স্থানে বুর্জোয়া চিন্তা ভাবনার জন্ম দেয়।

**নবজাগরণের স্বরূপ ঃ** মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের কালে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল এবং অন্যান্য নগর দখল করার ফলে সেখানকার গ্রীক পণ্ডিতগণ মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশে বিশেষ করে ইটালিতে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে, অনেক পণ্ডিত এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রেনেসাঁস বা নবজাগরণ শুরু হয়। এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই সব শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা শুরু হয়। এই বিদ্যাচর্চা মানুষের চিন্তাজগতে আমূল পরিবর্তন আনে। পুরানো চিন্তা-ভাবনার খোলস ছেড়ে, নতুন স্বাধীন চিন্তা মানুষের মনে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে যিনি পথিকৃৎ তিনি হলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিটার আবেলার্ড। স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদে বিশ্বাসী আবেলার্ড

ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন কোন মতবাদ বা ধারণাকে চার্চের নির্দেশ বা ঈশ্বরের বিধান বলে গ্রহণ না করতে, যতক্ষণ না যুক্তি তর্ক দ্বারা কোনো ধারণা বা মতবাদ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

এরপর মানুষ বুঝতে শিখল কেবল সংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসই নয়, যুক্তি দিয়ে বিচার করে সব কিছুকে গ্রহণ করাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত কর্ম। মানুষ আরও চিন্তা করতে শিখলো, কেবল ধর্মীয় ব্যাপার বা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। পৃথিবীতে আরও বহু বিষয় জানার প্রয়োজন আছে। স্বভাবতই এই নূতন চিন্তার উন্মেষ প্রাচীন ক্যাথলিক ধর্মমতের পরিপন্থী ছিল। তাই ক্যাথলিক চার্চ চিন্তার জগতে এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করে প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করতে থাকে। এর ফলে দেখা দিল গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসন এবং যুক্তি-আশ্রয়ী চিন্তার মধ্যে সংঘাত। কিন্তু চার্চের বিরোধিতা সত্বেও যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসার প্রভাব ইউরোপের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়েছিল।

**ইটালীর নেতৃত্ব দান :** ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রথম কেন্দ্র হয়ে ওঠে ইটালী। পরে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে। ক্রুসেডের সময় থেকেই ইটালীর বিখ্যাত শহর রোম ভেনিস, মিলান, প্রভৃতি আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। এই সব শহরের অধিবাসীরা ছিল মুক্ত মানবিকতার অধিকারী। ফলে নবজাগরণের স্পর্শ সর্বপ্রথম লেগেছিল এদের মনে।

ইটালীর ছোট ছোট রাজ্যের শাসকগণ এবং নগরের বড় বড় বণিক মহাজনরা গ্রীক পণ্ডিতদের আশ্রয়দান ও সাহায্য করতেন। শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞানের উৎসাহদাতারূপেও এই সব শাসক বণিকরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। ঈশ্বর ও ধর্মতত্ত্বের পরিবর্তে মানবতাবাদী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ও যুক্তিবাদের ওপর এই সব বণিক সম্প্রদায় নিজেদের দাঁড় করাবার চেষ্টা করতেন।

ইটালীর ফ্লোরেন্সেই ছিল রেনেশাঁসের সূত্রপাত। এই নগরের

অধিবাসীরা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়, শিক্ষানুরাগী, শিল্পরসিক। এদের মধ্যে দুই বিত্তশালী নাগরিক ছিলেন কসিমো ও মেডেসি।




কসিমো ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী। আর মেডিসি ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। এই দুই ব্যক্তির আদেশে অনুপ্রাণীত হয়ে ফ্লোরেন্সের বড় বড় অভিজাত পরিবার ও বণিক সম্প্রদায় প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। এর ফলে ফ্লোরেন্স দ্বিতীয় এথেন্সের মর্যাদা লাভ করে।

ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁসের বিকাশের কয়েক বৎসরের মধ্যেই উত্তর ইটালীর অন্যান্য শহরেও রেনেশাঁস বিকশিত হয়েছিল। ভেনিস

মিলান, রোম এবং অন্যান্য শহরেও প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসারিত হয়। এই সকল শহরও শিল্প, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইটালীর বাইরে ফ্রান্স, জার্মান, নেদারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও রেনেসাঁস ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইটালীর নব জাগরণের প্রভাব থেকে এরা নিজেরা স্বাধীনভাবে কিছু করলেও পরোক্ষে ইটালীর প্রভাব এই সব দেশে কিছু পরিমানে বিস্তার লাভ করে। রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য স্পেন ও ফ্রান্স দীর্ঘদিন ইটালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায়, স্পেন ও ফ্রান্স ইটালীর রেনেশাঁসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এমন কি ইংলণ্ডও ইটালীর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলো না। শেক্সপীয়ারের অনেক নাটকের ঘটনা ছিল ইটালীর বিভিন্ন শহর।

কিন্তু নবজাগরণের কোন প্রভাব পড়লো না ভারতবর্ষে। ভারতে তখন চলছিল লোদিবংশ। কেন রেনেশাঁসের প্রভাব ভারতে পড়লো না, এ নিয়ে আজও গবেষণা চলছে। ভারতে রেনেশাঁর সূত্রপাত হলো উনিশ শতকের প্রথম দিকে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ইউরোপীয় নবজাগরণ যখন তার প্রগতিশীলতার শেষ চিহ্ন মুছে দিয়ে, সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতার পতাকাকে ধুলায় অবলুণ্ঠিত করে দিয়েছে, ঠিক সেই সময় ইউরোপের স্থবির ও জরাগ্রস্ত নবজাগরণ খণ্ডিত আকারে ভারতে দেখা দিল রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে।

অনেকের মতে ইটালীর নবজাগরণকে যিনি ইটালীর বাইরে অনেক দেশে সম্প্রসারিত করেছিলেন তিনি হলেন এগ্রিকোলা নামে জনৈক ইটালীর পণ্ডিত।

তিনি ছিলের জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অন্যান্য যারা ইটালীর পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেদের দেশে এনে তাদের মাধ্যমে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস, স্পেনের রাজা দ্বিতীয়

ফিলিপ ও ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ। ইংলণ্ডে নবজাগরণের আর এক প্রাণপুরুষ ছিলেন কবি চসার। এই সব কারণেই ইটালীকে নবজাগরণের প্রথম কেন্দ্র বলা হয়।

**চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ ঃ** রেনেসাঁস যুগে ইউরোপে ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত একটা ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করেছিল। ধর্মের প্রভাবকে অতিক্রম করে মানুষের জয়গান করাই ছিল নব যুগের তথা রেনেশাঁস আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্যসেবিরা নিজের নিজের মাতৃভাষাকেই সাহিত্যের প্রধান হাতিয়ার করেছিল। এর ফলে বিভিন্ন দেশে তাদের নিজেদের মাতৃভাষাই কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে। আর এইসব মানবতাবাদী সাহিত্যিকের অনেকেই ইটালিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং সাহিত্যের নবজাগরণের সূত্রপাতও ইটালীতে হয়েছিল। এরপর আস্তে আস্তে জার্মান, ইংলণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই ধরনের সাহিতের নব-জাগরণের সূত্রপাত হয়।

তবে রেনেসাঁস আন্দোলন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পটভূমিকা তৈরি হয়েছিল খ্রীষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। তখন থেকেই যুক্তিবাদই আস্তে আস্তে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। যুক্তিবাদ হচ্ছে রেনেসাঁ তথা নবজাগরণের অন্যতম প্রধান কীর্তি। গবেষণার আলোতে প্রমাণিত হয়েছে, মধ্যযুগে যে যুক্তিবাদ আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করেছিল সেই যুক্তিবাদকেই রেনেশাঁসের নায়কগণ প্রধান অবলম্বন করেছিলেন। ইটালীতে এই সময় কয়েকজন যুগান্তকারী সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন দান্তে, পেত্রাক, মেকিয়াভেলি বোকাচি প্রমুখ।

ইটালির সাহিত্যিকদের মধ্যে যার নাম চিরস্মরণীয় তিনি হচ্ছেন দান্তে। ১২৬৫-১৩২১ দান্তে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লোরেন্স নগরে, ইটালি ভাষায় রচিত তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ডিভাইন কমেডি নামক মহাকাব্য, যা আজও মানুষের মনে চিন্তার খোরাক জোগায় সমসাময়িক যুগের

সমালোচনা ও স্বর্গ ও মর্ত্যে কাল্পনিক ভ্রমণ এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

কবি পেত্রাক ছিলেন (১৩০৪—১৩৭৪) ইউরোপীয় নবজাগরণের আর একজন পুরোধা। তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্য। মধ্যযুগীয় ধর্মচিন্তা বা ফিউডাল ধ্যান ধারণাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে স্থান দেন নি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানব-প্রেম, তাঁর সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল। এছাড়া পেত্রাক ছিলেন একজন সাহিত্যের গবেষক। তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথিপাঠ করে নতুন তথ্যের আবিষ্কার ও মূল্যায়ন করেন।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতিকে উপজীব্য করে অমর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন নিকোলো মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭)। ফ্লোরেন্সের এক মধ্যবিত্ত আইনজীবীর সন্তান মেকিয়াভেলি ছিলেন একাধারে কূটনীতিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। রাজনীতিই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণ। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বহু কূটনৈতিক পদ অলংকৃত করেছিলেন।



পেত্রাক

জীবনের শেষ ১৫ বছর ভাগ্যবিড়ম্বিত মেকিয়াভেলি বিভিন্ন রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সময়েই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি প্রিন্স'। তাঁর 'ফ্লোরেন্টাইন হিষ্টরী' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায় শক্তিশালী রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর মত ছিল ধর্ম বা নীতি বিধিনিষেধ দ্বারা

রাজতন্ত্র সীমিত হবে না। রাজা এবং জাতির স্বার্থে চাতুরী, উৎকোচ বা গুপ্তহত্যা কোন পন্থাকেই তিনি অন্যায় মনে করতেন না। তাঁর রাজনৈতিক মতামত ইতিহাসের বিশ্লেষণ থেকে গড়ে ওঠেনি। ইতিহাস থেকে তিনি সেই সকল ঘটনা তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেগুলি ছিল তাঁর মতামতের অনুকুল। তাঁর 'দি প্রিন্স' গ্রন্থটি দার্শনিকদের কাছে কঠোর-ভাবে নিন্দিত হলেও সমকালীন শাসকদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। জাতির স্বার্থের কথা বলতে গিয়ে মেকিয়াভেলি প্রকৃতপক্ষে শাসকের স্বার্থের কথাই বলেছেন। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কূটনীতি-বিদ চাণক্যের সঙ্গে মেকিয়া-ভেলিকে অনেক সময় তুলনা করা হয়।



মেকিয়াভেলি

বোকাচ্চিত্ত (১৩১৩-৭৫) ছিলেন এই সময়ে ইটালীয় বিখ্যাত সাহিত্যিক। আধু-নিক সাহিত্যের তিনিই ছোট গল্পের জনক বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। তার ডেকামেরন বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই ছোট্ট গল্প গুচ্ছের মধ্যে তিনি ইটালীয় জীবন ও সমাজের চিত্র শিল্পীর তুলির আছড়ের মতন প্রকাশ করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন তিনি।



শেক্সপীয়র

রেনেসাঁসের জোয়রে ইংলণ্ডেও নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। এই সময়েই আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়, ইংরাজী সাহিত্যের মহান স্রষ্টা উইলিয়াম শেক্সপীয়ার এই সময়ের মানুষ ছিলেন, তাঁর পূর্বে চসার ও স্পেনসার ইংরাজী সাহিত্যের সূচনা করেন।

শেক্সপীয়রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'দি মার্চেণ্ট অফ ভেনিস, জুলিয়াস সীজার, কারলিয়ার ওমেলো, হ্যামলেট, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতি। এই সমস্ত নাটকে শেক্সপীয়ার সামন্তবাদী ধারনাকে চূর্ণ করে দিয়ে উদার বুর্জোয়া চিন্তার স্ফুরণ ঘটান। সেই যুগে শেক্সপীয়ার তার নাটকে স্ত্রী স্বাধীনতার কথা সোচ্চারভাবে বলেন। এমন কি তার নাটকের মধ্যে স্থানে, স্থানে, প্রচ্ছন্নভাবে সাম্যবাদের কথাও বলা হয়েছে।

চসার (১৩৪৯-১৪০০) রচিত ক্যাটারবেরী টেলার তার অসামান্য রচনা যদিও এটি অসামাপ্ত কাব্য গ্রন্থ। কিন্তু এই অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে লোকচরিত্রের মানসিকতা অপূর্বভাবে উপস্থাপনা করেছেন।

স্পেনসার (১৫৫২-৯৯) তাঁর ফেরারী কুইন, কাব্যে রানী প্রথম এলিজাবেথের জীবনকে রূপক আকারে প্রকাশ করেছেন।

এই যুগে আর একজন ইংরাজ মনীষী ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি আজও স্মরনীয়। আমাদের বাংলা দেশে বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচায্য (১৮৩০-১৯৪২) বেকনের প্রবন্ধের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।



স্যার ফ্রান্সিস বেকন

নেদারল্যাণ্ডের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী ডেসিডেরিয়াস ইরাস্‌মাস (১৪৬৬-১৫১৬) ব্যক্তিগত জীবনে একজন যাজক হলেও মানবতাবাদী লেখক রূপে তিনি অধিক খ্যাত।

ফরাসী সাহিত্যে যার অবদান প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন ফ্রাঁসোয়া রাবেলের (১৪৯৬-১৫৫৩)। নানা বিষয়ে তাঁর রচিত অজস্র প্রবন্ধ রেনেসাঁস যুগের যুক্তিবাদী মানসিকত প্রতিফলিত হয়েছে গরগণতুয়া ও পেঁতাগ্রয়েল নামক ব্যাঙ্গী উপন্যাসে তিনি সেই সময়ের সামন্তশ্রেণী, যাজক সম্প্রদায় ও পণ্ডিতসমাজের দুর্নীতি ও বিলাস-ব্যসনকে তীব্র আক্রমণ করেন।

স্পেনীয় ভাষায় মিগুয়েল দা সারভেন্টিস (১৫৪৭-১৭১৬) রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত বই ডন কুইক্সোট, মধ্য যুগের অভিজাত শ্রেণীর ভণ্ডামিকে তিনি ব্যাঙ্গ করেছেন এই বইতে।

**রেনেসাঁস যুগের সাহিত্যে অবদান ঃ** বিভিন্ন দেশের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবিদের কার্যকলাপে সমগ্র ইউরোপে অতীত সভ্যতার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন পুঁথিগুলির পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হয় ট্যাসিটাস, লিভি প্রভৃতি রচনা। রেনেশাঁসের মূল অবদান ছিল মানবতাবাদ। আর ছিল যুক্তিবাদ। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা বাণী।

**শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ ঃ** চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অতীত সভ্যতার প্রতি আগ্রহ সঞ্চারে শিল্পীদের অবদানও কম নয়। স্বাভাবিক কারণেই মধ্যযুগের শিল্পকলা ছিল খ্রীষ্টান ধর্মভিত্তিক। নবজাগরণ প্রায় মধ্যযুগীয় সরল সুন্দর, সংযত শিল্পকলার প্রতি উৎসাহের সৃষ্টি করে। এই ক্লাসিকাল শিল্পরীতির প্রভাবে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে শিল্প চর্চার রূপান্তর ঘটে। খ্রীষ্টধর্মীয় বিষয়বস্তুর পাশাপাশি প্রাচীন গ্রীক-রোমীয় বিষরবস্তু ও রীতি শিল্পীদের আকৃষ্ট করে। ক্রমে ধর্মীয় বিষয়বস্তুতে ক্লাসিকাল শিল্পরীতির প্রয়োগে শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, খোদাই শিল্প, সঙ্গীত সর্বত্রই এর প্রভাব লক্ষণীয়।



লওনার্দো-দা ভিঞ্চি

মধ্যযুগের আড়ষ্ট শিল্পকলা আধুনিক যুগে বাস্তববাদী শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই যুগে যারা অগ্রণী শিল্পী ছিলেন তাদের মধ্যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাফায়েল এবং মাইকেল এঞ্জোলোর নাম উল্লেখযোগ্য।

ষোড়শ শতকের ইটালীর প্রখ্যাত চিত্রকরদের মধ্যে চারজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ছিলেন একজন জগৎ বিখ্যাত শিল্পী। চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি, কবি দার্শনিক রূপে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল জীবনকে ফুটিয়ে তোলা, তাঁর দুটি বিখ্যাত ছবি হচ্ছে 'মোনালিসা' ও 'দি লাষ্ট সাপার'।

রাফায়েল ছিলেন লিওনার্দের সময়ের আর এক জন উঁচুদরের শিল্পী। তার অঙ্কিত ম্যাডোনা শিল্পীকে অমর করে রেখেছে।

এযুগের আর একজন প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী হলেন মাইকেল এঞ্জেলো। তিনিও ছিলেন একাধারে স্থপতি, ভাস্কর চিত্রশিল্পী ও কবিরূপে খ্যাত, তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো মাতা মেরী ও যীশুখৃষ্টের প্রস্তর খচিত মূর্তি। লাষ্ট জাজমেণ্ট এবং পোপের প্রাসাদে তাঁর অঙ্কিত দেয়াল চিত্র জগৎ বিখ্যাত। চিত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে রাফায়েল ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর 'ম্যাডোনা' চিত্রটিও বিস্ময়কর। অন্যদিকে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার এবং তেল রঙের ব্যবহার ছিল তিশিয়ানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পোর্ট্রেট আঁকায় তিশিয়ান ছিলেন পারদর্শী। এই যুগের শিল্পীরা সবাই ছিলেন মানবতাবাদের পূজারী।


মাইকেল এঞ্জেলো

ষোড়শ শতকের আগে গীর্জা ও প্রাসাদের দেয়ালে চিত্রণের মধ্যেই

সাধারণত চিত্রাঙ্কন সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে দেয়ালের ন্যায় বুনট কাপড়, কাঠ এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপরেও ছবি আঁকা হয়। রঙের ঔজ্জ্বল্য তেল রঙের ব্যবহার ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সামঞ্জস্যবিধান জীবনের সুন্দর রূপ প্রভৃতি এ যুগের চিত্রশিল্পকে অমর করে রেখেছে।

**বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ:** শিল্প সাহিত্যের মতন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রেনেশাঁস যুগের অবদান কম ছিল না। পদার্থ বিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত সকল ক্ষেত্রেই এ সময়ে দারুণ অগ্রগতি ঘটেছিল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিবাদ সত্য অনুসন্ধানে এবং মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগে অনুপ্রেরণা দেয়। মধ্যযুগের শেষ দিক থেকেই জড়জগৎ এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় চর্চা শুরু হয়েছিল। হোহেনষ্টাফেন বংশের সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন বিজ্ঞানের উৎসাহদাতা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি চিড়িয়াখানা তিনি স্থাপন করেছিলেন। ১২২৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপীল্‌সে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং ইউরোপে বীজগণিত ও আরবীয় গাণিতিক সংখ্যার প্রচলন তার উদ্যোগেই হয়েছিল। ইংরেজ সন্ন্যাসী রজার বেকন (১২৩৫-১৩১৫) রসায়ন, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল। তাঁকে বলা হত 'দি ওয়াণ্ডারফুল ডক্টর'। সমকালীন আরব পণ্ডিতদের গ্রন্থাদি পাঠ করে তাঁদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতেন। প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে মানব-কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওপাস মেজাস'; তাঁকে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জনক।

বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ দার্শনিক স্যার ফ্রান্সিস বেকনেরও (১৫৬১-১৬১৬) অবদান রয়েছে। পরীক্ষণ ও আরোহানুমানের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্য অন্বেষণ এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সভ্য জীবন রূপান্তরের বিপুল সম্ভাবনার কথা তিনি বলেছেন।

প্রসিদ্ধ শিল্পী লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা। বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর উৎসাহ ছিল, জ্ঞান ছিল। জ্যোতির্বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, জলবিজ্ঞান, শারীরসংস্থান বিজ্ঞান, গণিত সকল বিষয়েই তিনি সমান আগ্রহী ছিলেন। জলের ধর্ম, পৃথিবীর সৃষ্টিকাল, শব্দের উৎপত্তি, বিস্তার, আলো ও দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তাঁর অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বাক্ষর দেয়।

এ যুগের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল জার্মানীর মেইনৎজ শহরের জোহান গুটেনবার্গের দ্বারা। তাঁর আবিষ্কৃত 'চলন্ত টাইপ' ছাপার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল। এর আগে ইউরোপে ব্লক করে ছাপার ব্যবস্থা ছিল। গুটেনবার্গ ধাতু দিয়ে বিভিন্ন অক্ষর আলাদাভাবে তৈরি করে সাজিয়ে ছাপার ব্যবস্থা করেন। ছাপা হয়ে গেলে অক্ষরগুলি পৃথক করে নূতন ছাপার কাজে বারংবার ব্যবহার করা যেত। আগে হাতে লিখে সাধারণতঃ বই নকল করা হত। তাতে দামও হত বেশী, সংখ্যাও হত কম। কিন্তু গুটেনবার্গের আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে কম খরচে বেশী বই ছাপানো সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গুটেনবার্গের পদ্ধতিতে ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং রেনেসাঁস যুগের মনীষীদের গ্রন্থরাজি সহজেই ছাপা হয়ে সাধারণ লোকের কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেয়।

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রাচীন ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগের জ্যোতির্বিদরা দ্বিতীয় শতকের গ্রীক দার্শনিক টলেমির তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র এবং চন্দ্র সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হয়। টলেমির এই ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব বাইবেলের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ষোড়শ শতকের আগে পর্যন্ত টলেমির তত্ত্বই খ্রীষ্টানদের কাছে পবিত্র সত্য বলে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু রেনেসাঁস যুগে প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার ফলে পুনরাবিষ্কৃত হয়

পীথাগোরাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের। এই তত্ত্বের নূতন প্রবক্তা হলেন নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)। পোল যাজক কোপারনিকাস গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে দশ বছর ইটালীতে থাকাকালীন তিনি প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করে টলেমির তত্ত্ব ভ্রান্ত বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সঠিক তথ্যের জন্য দীর্ঘদিন তিনি নক্ষত্ররাশির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ 'অন দি রিভোলিউশন অফ দি সিলেশ্চিয়াল বডিজ'। পৃথিবী যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়, সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহরাজির একটি মাত্র, এই সত্য তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।



কোপারনিকাশ

স্বাভাবিক ভাবেই কোপারনিকাসের তত্ত্ব ইউরোপের জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সঠিক তথ্যলাভের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি নির্মাণেরও চেষ্টা হয়। জার্মান বিজ্ঞানী কেপলার কোপারনিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করে বলেন যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহের সূর্য পরিক্রমার পথ বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি। কোপারনিকাসের তত্ত্বকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী ইটালির জ্যোতির্বিদ গ্যালিলেই গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)। কোপারনিকাসের প্রকল্পকে সমর্থন ও প্রমাণ করাই জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৬০৯ সালে একটি শক্তিশালী দূরবীণ নিজের হাতে নির্মাণ করে তার দ্বারা সূর্য, বৃহস্পতি প্রভৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে লব্ধ তথ্যের দ্বারা তিনি

কোপারনিকাসের প্রকল্পকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বাইবেলের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে গ্যালিলিওর বক্তব্যকে ধর্মবিরুদ্ধ বলা হয়। ১৬৩২ খ্রীঃ এই অপরাধে তার বিচার হয়। এর পর থেকে সারা জীবন তাঁকে নজরবন্দী রূপেই কাটাতে হয়েছিল। এর একশত বৎসরের মধ্যে কোপারনিকাসের তত্ত্ব সকলের কাছে স্বীকৃত হয়। এমনকি পোপও এই তত্ত্ব স্বীকার করে নেন।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) রেনেসাঁস বলিতে কি বুঝ? কোন সময়ে কোন ঘটনার ফলে ইউরোপে রেনেসাঁস হয়?

(খ) ইউরোপের নবজাগরণে কোন্ দেশ নেতৃত্ব দেয়? কেন?

(গ) ইউরোপের নবজাগরণে সাহিত্যক্ষেত্রের বিশাল অবদান সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

(ঘ) স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে রেনেসাঁস যুগে যে সমস্ত মণিষীর উদ্ভব হয়েছিল, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) রেনেসাঁস কথাটির বাংলা অর্থ কি? কত খ্রীষ্টাব্দে রেনেসাঁস শুরু হয়? ক্রুসেড অর্থ কি?

(খ) হিউম্যানিষ্ট কারা ছিলেন? এঁরা কি চেয়েছিলেন?

(গ) ইউরোপের কোন্ দেশের কোন্ শহর রেনেসাঁসের পথিকৃৎ কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই দেশে অথবা বাইরের কোন কোন্ স্থানে, রেনেসাঁস বিকশিত হয়?

(ঘ) ইংরেজী সাহিত্যের সর্বকালের সেরা স্রষ্টাদের অন্যতম কে ছিলেন? তাঁর আগে কোন্ কোন্ লেখক ইংরেজী সাহিত্যের সূচনা করেন?

(ঙ) পৃথিবী যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়, সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহরাজির একটি মাত্র,—এ সত্য কে প্রথম কোন্ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করেন?

(চ) রেনেসাঁস যুগে কার কোন্ আবিষ্কারের ফলে শ্রেষ্ঠ মণীষীদের শ্রেষ্ঠ রচনা লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে মহাদেশ জুড়ে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিল?

৩। টীকা লিখ :

পেতার্ক, দান্তে, শেক্সপীয়ার, মাইকেলএঞ্জেলো।

৪। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) আধুনিক যুগে ছোটগল্পের সূত্রপাত করেন গিওভানী বোকাচ্চিও/দান্তে।

(খ) এডমণ্ড স্পেন্সার তাঁর 'ফেরারী-কুইন' কাব্যে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের/প্রথম এলিজাবেথের জীবনকে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

(গ) 'মোনালিসা' হল 'লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি'র/'রাফায়েল'-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র।

(ঘ) শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কার করে কোপারনিকাসের/নিউটনের মতকে সমর্থন করেন টলেমি/গ্যালিলিও।

(ঙ) রজার বেকনকে/ফ্রান্সিস বেকনকে বলা হত দি ওয়াণ্ডারফুল ডকটর।

৫। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) ——মোট——টি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন।

(খ) প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত কূটনীতিবিদ——এর সঙ্গে——কে অনেক সময় তুলনা করা হয়।

(গ) চিত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে——ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর——চিত্রটি বিস্ময়কর।

ঘ) ——ভাষায় মিগুয়েল দা সারভেন্টিস রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত

ঙ) ব্রেমেন্টের নকসা অবলম্বনে নির্মিত রোমের——, ফ্রান্সের—— ও ——, ফ্লোরেন্সের——প্রভৃতি স্থাপত্য রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৬। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

ক) টলেমির আবিষ্কৃত 'চলন্ত টাইপ' ছাপার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিল।

খ) 'লাস্ট জাজমেণ্ট' নামের বিখ্যাত চিত্রটি এঁকেছিলেন মাইকেল এঞ্জেলো।

গ) রেনেসাঁসের যুগে প্রাচীন গ্রীক মন্দির শিল্পরীতির বদলে অনুসৃত হয় মধ্যযুগের গথিকরীতি।

ঘ। শেক্সপীয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'দি অ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব লার্নিং।'

ঙ। নাটক ছাড়াও শেক্সপীয়ার লেখেন। চতুর্দশপদী কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ।

———

## তৃতীয় অধ্যায়

# ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

**ভৌগোলিক-আবিষ্কার:** মধ্য যুগে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে ইউরোপের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। মার্কো পোলোর ন্যায় কয়েকজন দুঃসাহসী ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত থেকে পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে কিছু কিছু ধারনা সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

নবজাগরণ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে পৃথিবীর অজ্ঞাত অঞ্চল সম্পর্কে ইউরোপীয়দের অনুসন্ধিৎসা তীব্র করে। প্রধানত অর্থ-নৈতিক কারণে ইউরোপীয়রা ভৌগোলিক আবিষ্কারে উৎসাহী হয়। পঞ্চদশ শতকের আগে রেশমীবস্ত্র, সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্র, মশলা, মূল্যবান ধাতু ও পাথর, বিলাসোপকরণ ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরগুলির মাধ্যমেই ইউরোপে আমদানি করা হত। ইটালীর জেনোয়া এবং ভেনিস এ বিষয়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করত। এই সকল পণ্যের দাম অনেক বেশি দিতে হত বলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি প্রত্যক্ষভাবে পণ্য আমদানির জন্য বিকল্প জলপথের অনুসন্ধানে আকৃষ্ট হয়। পঞ্চদশ শতকে তুরস্ক নিকটপ্রাচ্য এবং কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করার ফলে ইটালীর বন্দরগুলির মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। প্রধানত বাণিজ্যিক কারণেই নতুন জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু হয়। বুর্জোয়া বণিক শ্রেণী, নবপ্রতিষ্ঠিত, জাতীয় রাজতন্ত্র এবং ধর্মপ্রচারকদের উৎসাহে নতুন জলপথ অন্বেষণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

উন্নত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রচলনও নৌ-অভিযানের সহায়ক ছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকেই ইটালীর নাবিকেরা কম্পাস বা দিক নির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল। পঞ্চদশ শতকে এস্ট্রোলাবের

সাহায্যে ল্যাটিচুড নির্ধারণের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়। জ্ঞাত জল-পথের ম্যাপ ও চার্টও প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর ফলে দূর জলপথে অভিযান অনেক সহজ হয়। এই পটভূমিকায় সম্পদ আহরণ ও গৌরব অর্জনের সম্ভাবনা দুঃসাহসী নাবিকদের নতুন জলপথ অন্বেষণে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। নৌ-অভিযানে ইটালীর নাবিকদের অভিজ্ঞতা বেশী হলেও নূতন জলপথের অন্বেষণে এগিয়ে এসেছিল পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, বিশেষত পর্তুগাল ও স্পেন।

প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল পর্তুগাল। পর্তুগীজরা আগেই জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে উত্তর আফ্রিকার আটলান্টিকের তীরে পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক কারণে পর্তুগাল এখন আরও দক্ষিণে যেতে উৎসাহী হয়। নাবিক হেনরী নামে পরিচত পর্তুগালের এক রাজকুমার হেনরী ( ১৩৯৪-১৪৬০ ) একটি নৌবিদ্যা শিক্ষার স্কুল স্থাপন করে অভিজ্ঞ ভূগোলবিদ এবং ইটালীর নাবিকদের দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখান থেকে পাঠান বিভিন্ন অভিযানের ফলে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে নূতন নূতন অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়। এই সকল অঞ্চল থেকে হাতির দাঁত এবং দাস আমদানি করা হত।

বারথেলোমিউ ডিয়াজ নামে এক পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার সর্বদক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করে এর নাম দিয়েছিলেন ঝড়ের অন্তরীপ। পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন এর নাম রাখেন উত্তমাশা অন্তরীপ।

১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বারথেলোমিউএর পথে অগ্রসর হয়ে ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে মালিন্দী পৌঁছান। সেখান থেকে একজন আরব পথপ্রদর্শকের সাহায্যে ১৪৯৮ এর মে মাসে ভাস্কো-দা গামা ভারতের কালিকটে পৌঁছান। এর ফলে ভারতে আসার নূতন জলপথ আবিষ্কৃত হয়। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচুর মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে তিনি পর্তুগালে ফিরে যান। এর পর থেকেই ঐ পথে পর্তুগীজ জাহাজ নিয়মিত ভারতে

আসতে থাকে। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পেড্রো কেব্রালের নেতৃত্বে আর একটি পর্তুগীজ নৌবহর উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার পথে তীব্র স্রোত ও ঝড়ে পশ্চিমদিকে সরে গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে উপস্থিত হয়। কেব্রাল ঐ অঞ্চলের নাম ব্রাজিল দিয়ে তা পর্তুগালের অধীন বলে ঘোষণা করেন।



ভাস্কো-দা-গামা

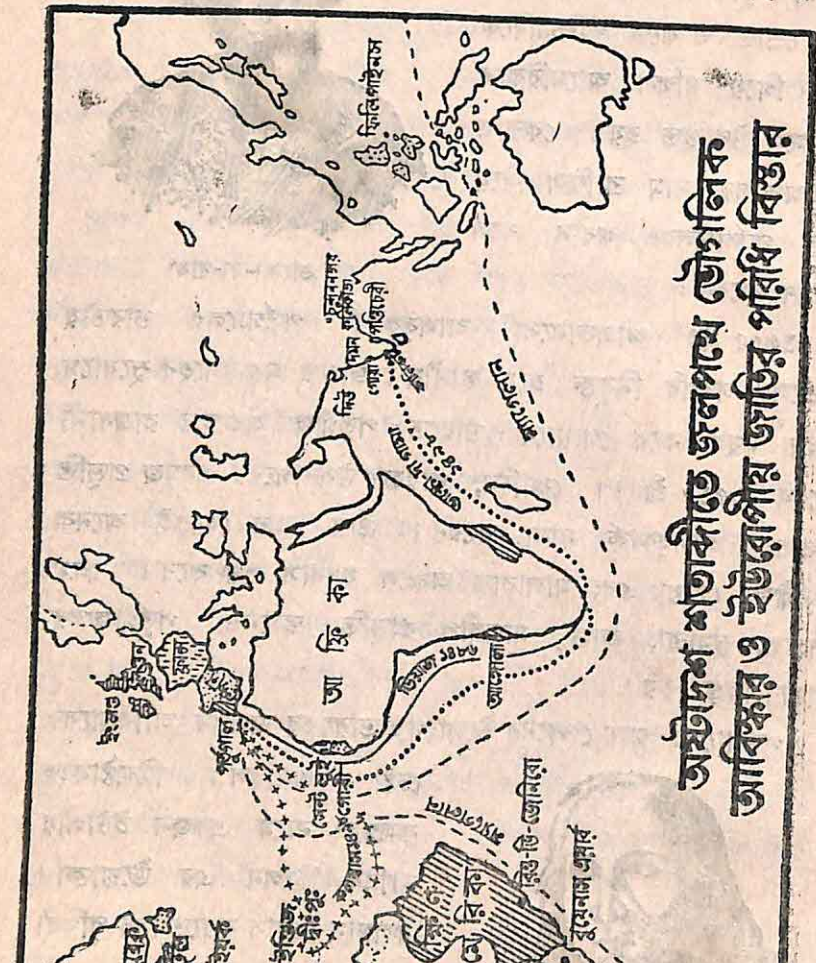
১৫০৫ খ্রীঃ আলফানসো আলবুকার্ক পর্তুগালের ভারতীয় অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে স্থানীয় রাজাদের অন্তর্কলহের সুযোগে গোয়া দখল করে গোয়াকে ভারতে পর্তুগীজ অঞ্চলের রাজধানী করেন (১৫১০ খ্রীঃ)। কোচিন, পারস্য উপসাগরের ওরমুজ প্রভৃতি অঞ্চলও আলবুকার্ক দখল করেন। তাঁর সময় থেকেই অনেক পর্তুগীজ গোয়া এবং মালাবার অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ক্রমে সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও পর্তুগীজদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

পর্তুগালের ন্যায় স্পেনের উদ্যোগেও ভারতের জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা চলছিল। ক্রিষ্টোফার কলম্বাস নামে একজন ইটালীয় নাবিক ছিলেন এর উদ্যোক্তা। কলম্বাস বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী গোলাকার এবং ইউরোপ থেকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলে ভারত ও চীনে পৌঁছান যাবে। কলম্বাস প্রথমে পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের সাহায্য প্রার্থনা করে বিফল হয়ে পরে স্পেন সরকারের সাহায্য প্রার্থী হন। স্পেনের রানী



কলম্বাস

ইসাবেলা কলম্বাসের অভিযানের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হলে কলম্বাস ১৯৪২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে স্পেনের পালোস বন্দর থেকে তিনখানি জাহাজ ও ৮৭ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। বহু বাধা



অষ্টাদশ শতাব্দীতে জলপথে ভৌগলিক আবিষ্কার ও ইউরোপীয় জাতির পরিধি বিস্তার

অতিক্রম করে কলম্বাস ১২ই অক্টোবর এক নূতন ভূখণ্ডে অবতরণ করে স্পেনের রাজার নামে ঐ ভূখণ্ড দখল করেন। ১৪৯৩ খ্রীঃ স্পেনে প্রত্যাবর্তন করে কলম্বাস স্পেনের রাজা-রাণী ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলাকে তাঁর ভারতে আসার নূতন পথের কথা জানান। কলম্বাসের ধারনা ছিল তিনি ভারতে পৌঁছেছিলেন। এই জন্যই আমেরিকায় আদি অধিবাসীদের এখনও ইণ্ডিয়ান ( রেড ) বলা হয়। ভারতে আসার নূতন পথ আবিষ্কার করতে না পারলেও কলম্বাস একটি নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর চারটি অভিযানের ফলে বাহামা, কিউবা, হাইতি, জামাইকা, ভেনেজুয়েলা, হন্দূরাস প্রভৃতি অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়।

স্পেনের সাহায্যে আমেরিগো ভেসপুসী নামে আরেকজন ইটালীয় নাবিক ১৫০৩ খ্রীঃ মধ্য আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলভাগ আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারেই নূতন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

১৫১৩ খ্রীঃ বালবোয়া নামে এক স্পেনীয় অভিযাত্রী পানামা যোজক অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগর উপস্থিত হন। ১৫১৯ খ্রীঃ ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক স্পেনের উদ্যোগে পাঁচটি জাহাজ নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা প্রদক্ষিণ করে প্রশান্ত মাহাসাগর অতিক্রম করে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান। এর নাম তিনি দিয়েছিলেন সেণ্ট লাজারাস ( পরবর্তীকালে ফিলিপাইনস )। ম্যাগেলান ফিলিপাইন্‌সে নিহত হলেও তাঁর একটি জাহাজ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করে স্পেনে ফিরে আসে। বাণিজ্যিক দিক থেকে যথেষ্ট ফলপ্রসূ না হলেও ম্যাগলানের অভিযানই ছিল জলপথে প্রথম ভূপ্রদক্ষিণ।


ম্যাগেলান

**তাৎপর্য :** এই সকল অভিযানের ফলে ভূগোলের জ্ঞানও যেরূপ প্রসারিত হয়, আবিষ্কৃত অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কও সেরূপ স্থাপিত হয়। ম্যাগেলানের প্রথম জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণের ফলে পৃথিবী যে গোলাকার এ ধারণা প্রমাণিত হয়। আবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বজায় রাখার জন্য ঐ সকল অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপিতও হয়। এর ফলে শুরু হয় ঔপনিবেশিক শোষণ। উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা দেয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৪৮০ এবং ১৪৯৩ খ্রীঃ দুটি নির্দেশ দ্বারা পোপ স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র ভাগ করে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধের চেষ্টা করেন। আফ্রিকা, এশিয়া এবং ব্রাজিল পড়ে পর্তুগালের ভাগে এবং উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা অধিকাংশ অঞ্চল (ব্রাজিল ছাড়া) পড়ে স্পেনের ভাগে। উপনিবেশগুলিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শোষণ করা হত না, অধিবাসীদের বন্দী করে দাসরূপে বিক্রীত করা হত। দাস ব্যাবসা ছিল খুব লাভজনক। নূতন মহাদেশে সোনা, রূপো মূল্যবান পাথর থাকায় স্পেন ঐ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করতে আগ্রহী হয়। স্পেনের কর্টেজ দখল করেন মেক্সিকো এবং পিজারো দখল করেন পেরু। স্পেনের এই সকল অভিযাত্রীদের বলা হত কঙ্কোয়েস্টাডোর। ষোড়শ শতাব্দীতে ইকুয়েডর, চিলি এবং কলম্বিয়াও স্পেনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) কোন্ কোন্ কারণে নবজাগরণের যুগে পশ্চিম ইউরোপের নাবিকেরা নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে ?

(খ) প্রধানতঃ কোন্ দুই ইউরোপীয় দেশ ভৌগোলিক আবিষ্কারে বিশেষ অগ্রণী হয় ? খুব সংক্ষেপে প্রধান আবিষ্কারের ঘটনাগুলো বিবৃত কর।

(গ) পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের তাৎপর্য কি ?

(ঘ) পর্তুগীজ নাবিকদের ভারত অভিযান ও ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ**

(ক) কলম্বাস কে ছিলেন ? তাঁর কি বিশ্বাস ছিল ? যথাক্রমে কার কার কাছে তিনি অভিযানের সাহায্য চেয়ে বিফল ও সফল হন ?

(খ) কবে কতজন নাবিকসহ কখানি জাহাজ নিয়ে কলম্বাস কোথা থেকে যাত্রা করেন ? রেডইণ্ডিয়ান কাদের এবং কেন বলা হয় ? কোন্ কোন্ স্থান আবিষ্কারের সঙ্গে কলম্বাসের নাম যুক্ত ?

(গ) কোন্ দেশের কোন্ নাবিকের নামে একটি বড় মহাদেশের নামকরণ হয় ? মহাদেশটির নাম কি ? নৌপথে সর্বপ্রথম ভূ-প্রদক্ষিণ করেন কে ? কঙ্কোয়েস্টাডোর কি ?

(ঘ) কিভাবে কাদের সহায়তায় কবে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কোথায় এসে পৌঁছান ? ভারতের কোন্ অঞ্চলটি পর্তুগীজেরা দখল করে রাজধানী স্থাপন করে কাকে প্রথম গভর্নর নিযুক্ত করে ?

৩। **টীকা লিখ :**

কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ম্যাগেলান।

৪। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) পঞ্চদশ শতকে এস্ট্রোল্যাবের সাহায্যে জ্যামিতিক পদ্ধতি/ল্যাটিচুড পদ্ধতি/দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়।

(খ) উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন ম্যাগেলান / ভাস্কো-ডা-গামা / বারথেলোমিউ ডিয়াজ।

(গ) বালবোয়া নামে এক স্পেনীয় অভিযাত্রী পানামা যোজক / উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে উপস্থিত হন।

৫। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) ——এর নাম অনুসারেই নতুন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা।

(খ) ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ স্পেনে প্রত্যাবর্তন করে কলম্বাস স্পেনের রাজা-রানী——ও——কে তাঁর ভারতে আসার নূতন পথের কথা জানান।

(গ) .৪৮• এবং ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ দুটি নির্দেশ দ্বারা পোপ——ও পর্তুগালের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র ভাগ করে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোধের চেষ্টা করেন।

৪। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) পর্তুগীজরা পানামা যোজক অতিক্রম করে উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হয়।

(খ) প্রধানত বাণিজ্যিক কারণেই নতুন জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টা সুরু হয়।

(গ) ত্রয়োদশ শতকের অনেক আগে থেকেই ইটালীর নাবিকেরা কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল।

---

## চতুর্থ অধ্যায়

# ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন

**ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ :** মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চ নানাভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অধিকাংশ যাজকই ছিল অজ্ঞ, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ভোগবিলাসী। উচ্চপদস্থ বিশপ এবং আর্চবিশপ এবং এমনকি পোপরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে সম্পদ সংগ্রহ এবং বিলাসবহুল দুর্নীতিগ্রস্ত জীবন এই সময়ে ক্যাথলিক চার্চের সর্বস্তরের বৈশিষ্ট্য ছিল। অর্থ সংগ্রহের জন্য নানারকম অযৌক্তিক উপায়ও গ্রহণ করা হত। কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও পাপমুক্তির নামে অর্থ নেওয়া হত। মঙ্গলদায়ক বলে সাধুদের দেহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির অংশ অর্থের বিনিময়ে ধারণ করার জন্য দেওয়া হত। এই রকম নানাবিধ উপায়ে যাজকেরা অর্থ সংগ্রহ করত। যে ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপের জন্য যাজকবৃত্তি গ্রহণ তাই তারা অবহেলা করত।

চার্চের মধ্যে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের পাশাপাশি ছিল রাজা, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং সাধারণ লোকের মনে ধর্মের প্রতি নিস্পৃহ

মনোভাব। চার্চ ও ধর্মের আধিপত্য রক্ষায় সাধারণ লোকের নির্লিপ্ততা, জাতীয় রাজা ও বুর্জোয়াদের চার্চের ক্ষমতা হ্রাসে আগ্রহ চার্চের আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, মানবতাবাদীদের দ্বারা চার্চের সমালোচনা প্রভৃতি কারণে ষোড়শ শতকে ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা দেয়।

প্রথমে এই আন্দোলন পোপ ও চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিলনা; বরঞ্চ চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করে জনমানসে চার্চের ভাবমূর্তি উজ্বল করে পোপ ও চার্চকে সৎ ও শক্তিশালী করাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্যাথলিক চার্চকে সংস্কার করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে এই আন্দোলন ক্রমশঃ পোপ ও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ নেয়।

চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার আন্দোলন ষোড়শ শতকের আগেও বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছিল। এই সকল আন্দোলনের মধ্যে ইংলণ্ডে জন ওয়াইক্লিফ (১৩২৮-৮৪) এবং বোহেমিয়ায় জন হাসের (১৩৭০-১৪১৫) নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দশ শতকের অক্সফোর্ডের যাজক জন ওয়াইক্লিফ চার্চের দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, চার্চ বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা দুর্নীতিমুক্ত না হলে জনসাধারণের আনুগত্য তাঁরা দাবী করতে পারেন না। কেবলমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই যাতে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন সেজন্য তিনি চার্চের সম্পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছাদানের দ্বারা যাজকের ব্যয় নির্বাহের কথা বলেছিলেন। ওয়াইক্লিফ মনে করতেন যে, ধর্মগ্রন্থ পাঠে সকলেরই অধিকার আছে। তাই তিনি বাইবেল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুগামীরা লোলার্ড নামে পরিচিত ছিল।

বোহেমিয়ার প্রাগের যাজক জন হাসও পঞ্চদশ শতকে চার্চের দুর্নীতির সমালোচনা করেছেন। হাস ওয়াইক্লিফের সঙ্গে সকল বিষয়ে একমত না হলেও তাঁর উপর ওয়াইক্লিফের প্রভাব ছিল।

ওয়াইক্লিফের ন্যায় তিনিও আধ্যাত্মিক বিষয়ে চার্চ এবং যাজকদের অপেক্ষা বাইবেলকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জন হাসের এই সকল বক্তব্যের জন্য ১৪১৫ খ্রীঃ তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর অনুগামীরা চার্চের সমালোচনা থেকে বিরত হয়নি।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন তীব্ররূপে দেখা দেয় ষোড়শ শতকে জার্মানিতে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের মাধ্যমে। প্রথমে শুধু মার্টিন লুথারের অনুগামীদের প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হলেও পরে যারা পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করত এবং গ্রীক চার্চেরও অনুগত নয় তাদেরও প্রোটেস্ট্যান্ট বলা হত।

জার্মানির এক সাধারণ পরিবারের সন্তান মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেন। ১৫০৮ খ্রীঃ তিনি উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। এই সময়ে লুথার ক্যাথলিক চার্চের 'সুকর্মে মুক্তির' উপায় তত্ত্বে সন্দিহান হন। চার্চের মতে আত্মার মুক্তিলাভের জন্য প্রত্যেক খৃষ্টানকেই কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাল কাজ করতে হবে। কিন্তু লুথারের মতে



মার্টিন লুথার

মানুষ এত দুর্নীতিপরায়ণ ও কলুষিত যে, কোন ভাল কাজ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মুক্তির জন্য মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁর করুণার উপর নির্ভর করতে হবে চার্চের 'সুকর্মে মুক্তির' বিকল্পরূপে লুথার 'বিশ্বাসে মুক্তি'র তত্ত্ব প্রচার করেন। ১৫১১ খ্রীঃ রোমে গিয়ে চার্চের দুর্নীতি দেখে লুথার ক্ষুব্ধ হন। লুথারের 'বিশ্বাসে মুক্তি'র তত্ত্ব তখনও চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরিণত হয়নি।

১৫১৭ খ্রীঃ রোমের সেন্ট পীটার গীর্জা সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য পোপ দশম লিওর প্রতিনিধি হয়ে টেটজেল জার্মানীতে 'ইনডালজেন্স' ( অর্থের বিনিময়ে পাপমুক্তি ) বিক্রী করতে আসেন। অর্থের বিনিনয়ে পাপমুক্তির ব্যবস্থাকে লুথার সমালোচনা করেন। লুথারের বক্তব্য দ্রুত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তিনটি পুস্তিকা প্রকাশ করে লুথার পোপ, যাজক এবং চার্চের দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ১৫২০ খ্রীঃ লুথারকে ধর্মবহির্ভূত ঘোষণা করে তাঁর গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়। লুথার তাঁকে ধর্মবহির্ভূত ঘোষণার পোপের আদেশটি পুড়িয়ে ফেলেন।

এইভাবে জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ক্যাথলিক চার্চে বিভেদের সৃষ্টি করে। চার্চের দুর্নীতির সমালোচনা করায় লুথারের বিরুদ্ধে পোপ ও কাউন্সিল কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, অথচ ইটালীর মানবতাবাদীগণ খ্রীষ্টান ধর্মের মূল নীতিকে আক্রমণ করলেও তাদের ধর্মবহির্ভূত করা হয়নি। সম্ভবত লুথারের বিরোধিতা চার্চের আথিক স্বার্থ ক্ষুন্ন করেছিল এবং পোপের কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল বলেই লুথারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

**লুথেরান চার্চের প্রতিষ্ঠা :** লুথারকে ধর্মবহির্ভূত ঘোষণা করা হলেও ব্যাপক জনসমর্থন এবং অনেক জার্মান শাসকের সমর্থনের জন্য লুথারকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায়নি। স্যাক্সনির শাসকের নিরাপদ আশ্রয়ে লুথার বাইবেলের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন।

লুথারের ধর্মমত দ্রুত মধ্য ও উত্তর জার্মানির রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। চার্চের দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ ধামিক ব্যক্তিরা লুথারকে সমর্থন করেছিল। দেশপ্রেমিকরা লুথারের আন্দোলনের মধ্যে দেখেছিল পোপ ও সম্রাটের শোষণের অবসানের সম্ভাবনা। ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সম্পদ লাভের আশায় জার্মানির শাসকেরাও এই আন্দোলন সমর্থন করেছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট হওয়ার জন্যই লুথারের ধর্মমত দ্রুত জার্মানিতে ছড়িয়ে

পড়েছিল। জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে ক্যাথলিক চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে লুথারীয় চার্চ স্থাপন করা হয়।

সম্রাট পঞ্চম চার্লস লুথারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে প্রোটেস্ট্যাণ্ট শাসকগণ এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ পাঠায়। এ থেকেই প্রোটেস্ট্যাণ্ট নামের উৎপত্তি। ১৫৩০ খ্রীঃ অগস্‌বার্গের ডায়েটেও মীমাংসা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রোটেস্ট্যাণ্ট শাসকগণ আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

**জার্মানির বাইরে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের প্রসার:** জার্মানির বাইরেও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রসারিত হয়েছিল। ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজা প্রথম ফ্রেডারিক ও তৃতীয় ক্রীশ্চায়ানের উদ্যোগে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম রাষ্ট্রধর্মরূপে স্বীকৃত হয়। রাজা গুস্তাভাস ভাসা ও চতুর্থ এরিকের সমর্থনে সুইডেনেও প্রোটেস্ট্যাণ্টমত বিস্তার লাভ করে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ইংলণ্ডে স্থাপিত হয় অ্যাংলিকান চার্চ। সুইজারল্যাণ্ড ক্যালভিন এবং স্কটল্যাণ্ডে জন নক্সের দ্বারা অন্য ধরণের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল।

**ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার:** ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি ও যাজকদের নৈতিক অধঃপতনের ফলে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম-মতের যেমন উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রচেষ্টাও হয়েছিল। যাজকদের নৈতিক মান উন্নত এবং চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য পোপ তৃতীয় পল কিছুটা চেষ্টাও করেছিলেন। চার্চকে শক্তিশালী করার জন্য একদিকে ধর্ম ও চার্চ বিরোধী মতবাদ নির্মূল এবং অপরদিকে চার্চের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হয়। সামগ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টা 'কাউণ্টার রিফরমেশন' নামে অভিহিত।

ধর্মবিরোধী মতবাদ নির্মূল করার প্রধান অস্ত্র ছিল ধর্মীয় বিচার সভা বা ইনকুইজিস্‌ন। ধর্মসংস্কার আন্দোলনেরও আগে স্পেনে এই ব্যবস্থায় অভিযুক্তকে বন্দী করে অত্যাচারের দ্বারা অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করা হত। তারপর সেই স্বীকারোক্তির

ভিত্তিতে তাকে পুড়িয়ে মারা হত। স্পেনের ধর্মীয় বিচার সভার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পোপ ধর্মীয় বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রথমে ৬ জন পরে ১২ জন কার্ডিনালের উপর এর দ্বায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। শাসকের অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন ক্যাথলিক দেশে ধর্মীয় বিচারসভা স্থাপনের জন্য পোপ অনুমতি দেন। ইটালী ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অনেক অঞ্চলে ধর্মীয় বিচারসভা স্থাপিত হয়। এর মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চের বিরোধী মনোভাবাপন্নদের শাস্তি দিয়ে চার্চকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়।

ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারে ধর্মীয় বিচারসভা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল স্পেনের ইগনেসিয়াস লোয়োলালের স্থাপিত সোসাইটি অব জেসাস্ বা জেসুইট সোসাইটি (১৫৩৪)। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের উচ্ছেদ করে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব বিস্তার করা। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ছিল এই সোসাইটির বৈশিষ্ট্য। ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি এই সোসাইটির প্রধান কাজ। প্রোটেস্ট্যান্ট অঞ্চলে গোপন প্রচার, নবাবিষ্কৃত দেশ সমূহে অখ্রীষ্টানদের ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত করণের কর্মসূচীও জেসুইট সোসাইটি গ্রহণ করে। এই সকল কাজের ফলে প্রোটেস্ট্যান্টদের ক্যাথলিক ধর্মে ফিরিয়ে আনতে না পারলেও নূতন নূতন দেশে ক্যাথলিক ধর্মের বিস্তার হয়েছিল।

চার্চের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে আগে থেকেই সাধারণ পরিষদ আহ্বান করার জন্য পোপকে সম্রাট পঞ্চম চার্লস বারংবার অনুরোধ করেছিলেন। ১৫৪২ খ্রীঃ সাধারণ পরিষদ আহ্বান করা হলে অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতির জন্য সভা স্থগিত থাকে। স্থগিত সভা ১৫৪৫ খ্রীঃ ট্রেন্ট নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। পোপ সংস্কার প্রস্তাব অপেক্ষা ধর্মীয় বিধি প্রণয়নেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ পরিষদ ধর্মবিধি এবং সংস্কার প্রভাব আলোচনা করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়। এগুলি হল প্রথমতঃ কার্ডিনাল ছাড়া অন্য সকল বিশপ তাঁদের কর্মক্ষেত্রে বাস করবে এবং চার্চগুলি নিয়মিত

পরিদর্শন করবে। দ্বিতীয়তঃ, জেরোমে ল্যাটিন বাইবেলকেই প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থরূপে মেনে নেওয়া হবে। তৃতীয়তঃ, ধর্মবিধি ধর্মগ্রন্থ এবং ঐতিহ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হবে। এবং চতুর্থতঃ, ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করার অধিকারী হবে চার্চ।

১৫৪৭ খ্রীঃ ট্রেন্ট থেকে বোলোনায় সাধারণ পরিষদের অধিবেশন স্থানান্তরিত করার ফলে বাস্তবে অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। পোপ তৃতীয় জুলিয়াস সাধারণ পরিষদের অধিবেশন পুনরায় ট্রেন্টে করার আদেশ দিয়ে লুথারীয়দেরও যোগদানে অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৫৫১-৫২ খ্রীঃ দ্বিতীয় অধিবেশনে লুথারীয়গণ যোগ দিলেও ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধিদের কঠোর মনোভাবে কোন মিলন সম্ভব হয়নি। ১৫৬২-৬৩ খ্রীঃ ট্রেন্টে তৃতীয় অধিবেশনে লুথারীয়দের আহ্বান করা হলেও তারা যোগ দেয়নি। তৃতীয় অধিবেশনে সুস্পষ্ট ধর্মবিধি প্রণয়ন এবং পোপের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়। যাজকদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন এবং যাজকদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ করা হয়। তাছাড়া ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের পক্ষে কতকগুলি বই পড়া নিষিদ্ধ করা হয়। এই অধিবেশনের ফলে প্রোটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে মীমাংসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

## পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ

**প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্য সমবায় বনাম পঞ্চম চার্লস :** (১৫৪৬-১৫৫৫)। ১৫০০ এর ডিসেম্বরে গঠিত প্রোটেস্ট্যান্ট সংঘের নেতৃত্বে ছিলেন স্যাক্সনির ইলেকটর জন এবং হেসের শাসক ফিলিপ। ক্যাথলিক চার্চের পৃষ্ঠপোষক পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সম্ভাব্য আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য প্রোটেস্ট্যান্ট সংঘ প্রস্তুত হলে উভয় পক্ষের পক্ষে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের সাহায্য লাভের আশাও প্রোটেস্ট্যান্টদের ছিল। কিন্তু সম্রাট পঞ্চম চার্লস ফ্রান্স ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় এই সময় জার্মানিতে উভয় ধর্ম গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যক্ষ

সংঘর্ষ শুরু হয়নি। পরবর্তী কয়েক বছরে আরও কয়েকজন জার্মান শাসক প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘে যোগ দেয়। এই সকল শাসকদের রাজ্যে ক্যাথলিক চার্চের অনেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্তও করা হয়।

ধর্মীয় বিরোধ ছাড়া রাজনৈতিক কারণেও পঞ্চম চার্লস প্রোটেস্ট্যাণ্ট শাসকদের সংঘকে দমন করতে চেয়েছিলেন। এই সংঘ জার্মানিতে সম্রাটের আধিপত্যের প্রতিবন্ধক ছিল। তাই তুরস্ক ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের অবসানে পঞ্চম চার্লস প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘকে দমন করতে চেষ্টা করেন। ১৫৪৫ এ ট্রেণ্টে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হলে চার্লস কূটনীতির দ্বারা জার্মামির অনেক শাসকের সমর্থন লাভ করেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হয়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘ এই সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তা সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম দিকে ১৫৪৬ এ চার্লস বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ১৫৪৮ এ স্যাক্সণীর জন ফ্রেডারিক এবং হেসের ফিলিপ পঞ্চম চার্লসের হাতে বন্দী হন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট সংঘের পরাজয়ে জার্মানিতে ক্যাথলিক চার্চের অধীনে ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধের ফলে এ সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায়। পোপ সাধারণ পরিষদকে ট্রেণ্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে যান এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৫৪৯-এ পোপ তৃতীয় পলের মৃত্যু হলে নূতন পোপ তৃতীয় জুলিয়াস আবার সাধারণ পরিষদের সভা ট্রেণ্টে করতে অনুমতি দিলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধিতা সাময়িকভাবে এড়ান সম্ভব হয়। ১৫৫২ খ্রীঃ স্যাক্সনির মরিস সম্রাটের পক্ষ পরিত্যাগ করে প্রোটেস্ট্যাণ্ট পক্ষে যোগ দিলে পঞ্চম চার্লস বাধ্য হয়ে পাসুর সন্ধির দ্বারা জার্মানির ধর্ম সমস্যা একটি ডায়েটের সভায় মীমাংসা করতে রাজী হন। ১৫৫৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে অগ্‌সবার্গে ডায়েটের অধিবেশনে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। অগ্‌সবার্গের এই সন্ধির দ্বারা জার্মানিতে লুথারের ধর্মমত ক্যাথলিক ধর্মের সমমর্যদা লাভ করে। স্থির হয় যে জার্মানির রাজ্যগুলিতে শাসকের ধর্মই প্রজার ধর্ম হবে;

এক রাজ্যে একটিই ধর্মমত প্রচলিত থাকবে এবং অন্য ধর্মমতাবলম্বী-দের দেশত্যাগে অনুমতি দেওয়া হবে ; ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৫৫২ খ্রীঃ এর অবস্থা বজায় থাকবে। ধর্মের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে আলোচনার দ্বারা মীমাংসা করা হবে।

অগ্‌সবার্গের সন্ধির দ্বারা ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলেও লুথারের ধর্মমত ছাড়া অন্য কোন প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত (ক্যালভিনীয় মত) স্বীকৃত না হওয়ায় ভবিষ্যৎ বিরোধের সম্ভাবনা থেকে গেল। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধেরও সুষ্ঠু সমাধান করা হয়নি। রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম নীতি স্বীকৃত হওয়ায় শাসকের দ্বারা অত্যাচারের দুয়ারও খোলা রইল। বস্তুতঃ ত্রিশ বছরের যুদ্ধ এবং ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধির (১৬৪৮) আগে জার্মানির ধর্ম বিরোধের মীমাংসা সম্ভব হয়নি।

**নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ :** সতেরোটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত নেদারল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে ক্যালভিনের প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম এবং দক্ষিণাঞ্চলে ক্যাথলিক ধর্ম পঞ্চম চার্লসের সময় থেকেই প্রচলিত ছিল। নেদারল্যাণ্ডের প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিরুদ্ধেও ধর্মবিচার সভার দ্বারা অত্যাচার করা হত। পঞ্চম চার্লসের পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন, মিলান, নেদারল্যাণ্ড ও নেপলস এর রাজা হন। গোঁড়া ক্যাথলিক ফিলিপ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের উচ্ছেদে কৃতসংকল্প ছিলেন।

পঞ্চম চার্লসের সময় থেকে নেদারল্যাণ্ডের অসন্তোষ ফিলিপের সময় বিদ্রোহে পরিণত হয়। নেদারল্যাণ্ডের শহর এবং অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে রাজার হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করায় অভিজাত শ্রেণী অসন্তুষ্ট হয়। নেদারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক চার্চের সাংগঠনিক সংস্কার প্রস্তাবে ক্যাথলিকরাও ক্ষুব্ধ হয়। উপরন্তু নেদারল্যাণ্ডে অবস্থিত স্পেনের সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার সকলকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই অবস্থায় সামন্তশ্রেণী অরেঞ্জের ডিউক উইলিয়ামের নেতৃত্বে চার্চের সাংগঠনিক প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবী

জানালে ফিলিপ তা মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রস্তাব ফিলিপ প্রত্যাখান করেন। শাসন পরিষদে নেদারল্যাণ্ডীয়দের নিয়োগেও ফিলিপ রাজী হননি। ক্যাথলিক বিরোধীদের প্রতিও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৫৬৬ খ্রীঃ সামন্তরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দাবী জানায়। নেদারল্যাণ্ডের অনেক স্থানে চার্চের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। ফিলিপ ধর্মবিরোধীদের শাস্তিদানের জন্য আলভার ডিউককে গভর্ণর জেনারেল করে নেদারল্যাণ্ডে পাঠান।

তাঁর অত্যাচারে অনেকে দেশের বাইরে পালিয়ে যান, বহু লোকের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। করভার অত্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বিপুল করভারে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সৈন্য বাহিনীর লুণ্ঠন ও অত্যাচারে লোকের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়।

এই অবস্থায় বিদ্রোহীরা ব্রিল শহর দখল ( এপ্রিল, ১৫৭২ ) করলে প্রায় সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সামন্তরা অরেঞ্জের উইলিয়ামকে ষ্ট্যাডহোল্ডার বা গভর্ণররূপে মেনে নিয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

ইতিমধ্যে দক্ষিণাঞ্চলেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। আলভা দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীদের সহজেই পরাজিত করে উত্তরাঞ্চলেরও কয়েকটি স্থান দখল করেন। ১৫৭৬ এর নভেম্বরে আলভার পরিবর্তে ডন লুই গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ডন লুই এর মৃত্যু ( ১৫৭৬ ) হলে ডন জন তাঁর স্থানে নিযুক্ত হন। ঐ বছরেই ঘেণ্টের সন্ধির দ্বারা দক্ষিণের প্রদেশ-গুলি উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু এই ঐক্য স্থায়ী হয়নি। জার্মানভাষী প্রোটেস্ট্যাণ্ট উত্তরাঞ্চল এবং ফরাসী ভাষী ক্যাথলিক দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে ডন জন বিরোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। দক্ষিণাঞ্চল ফিলিপের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে উত্তরাঞ্চল ইউট্রেক্টের সন্ধির (১৫৭৯ ) দ্বারা ধর্মীয় ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়। ফিলিপ উইলিয়ামকে হত্যার জন্য

পুরস্কার ঘোষণা করলে উত্তরাঞ্চল ফিলিপের প্রতি আনুগত্যও অস্বীকার করে। ১৫৮৪ খ্রীঃ জুন মাসে উইলিয়াম গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে মুক্তিযোদ্ধারা সাময়িক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৫৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের আর্মাডার (১৫৮৮) ব্যর্থতার ফলে নেদারল্যাণ্ডের সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্বল হয়। এর পরেও কুড়ি বছর উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। ১৬০৯ খ্রীঃ উভয় পক্ষের মধ্যে ১২ বছরের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়। ১৬৪৮ খ্রীঃ ওয়েষ্টফালিয়ার সন্ধিতে নেদারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। উত্তরাঞ্চল একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ক্যাথলিক দক্ষিণাঞ্চলে গঠিত বেলজিয়াম রাজ্য প্রথমে অষ্ট্রীয় নেদারল্যাণ্ড নামেই পরিচিত হয়।

**ইংলণ্ডের সঙ্গে বিরোধ ঃ** কেবল নেদারল্যাণ্ড নয়, প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ডকেও ফিলিপ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী মেরী টিউডরকে বিয়ে করে ইংলণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা ১৫৫৮ খ্রীঃ মেরীর মৃত্যুতে ব্যর্থ হয়। মেরীর পরে এলিজাবেথ রাণী হলে ফিলিপ এলিজাবেথকে বিয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কিন্তু এলিজাবেথ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত গ্রহণ করায় এবং ইংরেজ জলদস্যুদের স্পেনের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠনে উৎসাহ দেওয়ায় ফিলিপ এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করতে চান। এছাড়া নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের ইংলণ্ড সাহায্য করায়ও ফিলিপ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তবে নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এবং এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করলে ফরাসী রাজ্যের স্ত্রী মেরী স্টুয়ার্টের ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভের সম্ভাবনা থাকায় ফিলিপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু ১৫৮০ খ্রীঃ থেকে ইংলণ্ডের সঙ্গে স্পেনের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়। ঐ বছর স্পেনের বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠনকারী ড্রেককে এলিজাবেথ সম্মানিত করেন। ১৫৮৪তে স্পেনের রাজদূতকে তিনি প্রত্যাখান করেন এবং পরের বছর নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদের সাহায্যে সৈন্য পাঠান।

এই অবস্থায় ১৫৮৭তে মেরী স্টুয়ার্টের প্রাণদণ্ড হলে ফিলিপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক বিরাট নৌ-অভিযানের সংকল্প করেন। স্পেনীয় আর্মাডা নামে খ্যাত এই নৌ-বাহিনীতে ১৩০টি জাহাজ, ৮০০০ নাবিক এবং ১৯,০০০ সৈন্য ছিল। তাছাড়া নেদারল্যাণ্ডে অবস্থিত স্পেনের ৩৩,০০০ সৈন্যও এই অভিযানে যুক্ত হয়েছিল। ১৫৮৮ সালে এই অভিযান পাঠান হলে ইংলণ্ডের রণকৌশলে স্পেনের নৌবহর পরাজিত হয়। বৃহদায়তন শ্লথগতি স্পেনীয় জাহাজ ক্ষুদ্রাকৃতি দ্রুতগতি সম্পন্ন ইংলণ্ডের জাহাজের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। অজেয় আর্মাডার দুই-তৃতীয়াংশের বেশী ধ্বংস হয়।

আর্মাডার ব্যর্থতার পর থেকে ইউরোপের রাজনীতিতে স্পেনের আধিপত্য হ্রাস পায়। নৌ-পথে ইংলণ্ডের প্রাধান্যের সূচনা দেখা দেয়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত উচ্ছেদের স্পেনীয় প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) প্রধানত কোন্ বিশেষ কারণে মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এবং পোপ ও চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বেঁধে ওঠে?

(খ) কোন্ দুই ইউরোপীয় নেতা প্রথম কিভাবে চার্চ ও ধর্মযাজকদের সমালোচনা করেন?

(গ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ক্যাথলিক চার্চের তত্ত্বের সঙ্গে মার্টিন লুথারের তত্ত্বের প্রধান বিভেদ কি ছিল? মার্টিন লুথারের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ঘটনাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(ঘ) সম্রাট পঞ্চম চার্লস কিভাবে প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের দমন করবার চেষ্টা করেছিলেন? ফল কী হয়েছিল?

(ঙ) রাজা ফিলীপ কিভাবে নেদারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) মধ্যযুগে ইউরোপের যাজক সম্প্রদায় কি ধরণের লোক ছিলেন? অর্থ সংগ্রহের জন্য কোন্, কোন্, উপায় তারা অবলম্বন করতেন?

(খ) মার্টিন লুথার কে ছিলেন? তাঁর নীতি কি ছিল?

(গ) প্রোটেস্ট্যান্ট কাদের বলা হয়? এরা কোন্ ধর্মের লোক? এরূপ নামকরণের তাৎপর্য কি?

(ঘ) ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ইউরোপের ধর্মযুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট সংঘের নেতৃত্বে কারা ছিলেন এবং ক্যাথলিক চার্চের পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন? আর কোন্ কারণে ক্যাথলিক চার্চের পৃষ্ঠপোষক বিরুদ্ধাবাদীদের দমন করতে চেয়েছিলেন?

৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার আন্দোলনের মধ্যে ইংলণ্ডের—এবং বোহেমিয়ার—নেতৃত্বে গঠিত আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

(খ) যারা—প্রাধান্য অস্বীকার করত এবং গ্রীক চার্চেরও অনুগত নয় তাদের—বলা হত।

(গ) ১৫১৭ খ্রীঃ রোমের—সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয়, অর্থসংগ্রহ জন্য —প্রতিনিধি হয়ে—জার্মানীতে—বিক্রী করতে আসেন।

(ঘ) —প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত গ্রহণ করায় এবং—জলদস্যুদের—বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠনে উৎসাহ দেওয়ায় ফিলিপ—সিংহাসনচ্যুত করতে চান।

৪। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) পঞ্চম চার্লসের সময় থেকে নেদারল্যাণ্ডের অসন্তোষ ফিলিপের সময় বিদ্রোহে পরিণত হয়।

(খ) ১৫৮৪ খ্রীঃ জুন মাসে উইলিয়ম গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হলে মুক্তিযোদ্ধারা সাময়িকভাবে সবল হয়।

(গ) আর্মাডার ব্যর্থতার পর থেকে ইউরোপের রাজনীতিতে স্পেনের আধিপত্য বাড়ে।

৫। **টীকা লিখ :**

(ক) জেস্যুইট সোসাইটি খ। ইনকুইজিশন গ। স্প্যানিশ আর্মাডা।

## পঞ্চম অধ্যায়

# সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের বিপ্লব

সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কমন্সসভার জয়লাভ। পঞ্চদশ শতকের শেষে ইংলণ্ডে টিউডল রাজবংশ স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে দীর্ঘকাল রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বের শেষদিকে স্পেনের আর্মাডার পরাজয়ের ফলে বৈদেশিক আক্রমণের শঙ্কামুক্ত পার্লামেণ্ট রাণীর স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। প্রখর বুদ্ধিশালিনী এলিজাবেথ বিরোধের মূল কারণগুলি দূর করেও সাময়িকভাবে পার্লামেণ্টের অসন্তোষ প্রশমিত করতে সক্ষম হন।

**পার্লামেণ্ট ও রাজার** বিরোধ: এলিজাবেথের পরে ১৬০৩ খ্রীঃ স্কটল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম জেমস ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। প্রথম জেমস্ ও তাঁর পুত্র প্রথম চার্লসের সময় বিভিন্ন কারণে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষে পরিণত হয়। প্রধানত শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে এই বিরোধিতা দেখা দেয়।

প্রথমত, প্রথম জেমস্ এবং প্রথম চার্লস্ উভয়েই মনে করতেন যে, রাজা ঈশ্বরের আশীর্বাদে ক্ষমতা লাভ করেছেন, এবং রাজার ক্ষমতা অসীম। তাই বিভিন্ন নিয়মবিধি ও দলিলের ( যেমন ম্যাগনা কার্টা ) দ্বারা ইংলণ্ডে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস অবৈধ। কিন্তু পার্লামেণ্ট রাজার অসীম স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরোধী ছিল।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ ছিল। প্রশাসনিক ও রাজার ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা ছিল। অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ ছিল পার্লা-

মেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণে জেমস্‌এর অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পার্লামেণ্ট মঞ্জুর না করায় জেমস্ পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়াই শুল্কবৃদ্ধি, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার বিক্রী বাধ্যতামূলক ঋণ ও দান আদায় প্রভৃতি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। পার্লামেণ্ট প্রতিবাদ করায় অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তৃতীয়তঃ, ধর্ম ছিল বিরোধের আর একটি বিষয়। টিউডর আমলে ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলিকান চার্চের কর্তা ছিলেন রাজা। পিউরিটান নামে পরিচিত গোঁড়া প্রেটেস্ট্যাণ্টগণ চার্চের সংস্কার এবং চার্চ থেকে রাজার আধিপত্যের অবসান দাবী করায় জেমস্ পিউরিটান-দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এই তিনটি প্রধান কারণ ছাড়া বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও বিরোধ ছিল। জেমস চেয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের সংযুক্তি এবং স্পেনের সঙ্গে মৈত্রী। এর কোনটাই পার্লামেণ্ট সমর্থন করেনি। ব্যক্তিগত ভাবেও জেমস্ ছিলেন অপ্রিয়। জাতিতে স্কচ হওয়ায় এবং স্কচদের বেশী সুযোগ সুবিধা দান করায় ইংরেজরা জেমস্‌কে বিদেশী বলেই মনে করত।

জেমসের বিভিন্ন পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য ছিল পিউরিটান বা পিউরিটানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বুর্জোয়া বণিক শ্রেণীর মধ্যে পিউরিটানদেরই বেশী প্রভাব ছিল। জেমসের অনেক ব্যবস্থাই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করেছিল। রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ এদের সমর্থন ছিল পার্লামেণ্টের প্রতি।

জেমসের পরে প্রথম চার্লস রাজা হলে সাময়িকভাবে আপোষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। জেমসের ন্যায় চার্লস ব্যক্তিগতভাবে অপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও সীমাহীন রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী চার্লসের সঙ্গেও পার্লামেণ্টের বিরোধ দেখা দেয়। অতিরিক্ত অর্থ-বরাদ্দের প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিলে চার্লস প্রথম দুটি পার্লামেণ্ট বাতিল করে দেন। তৃতীয় পার্লামেণ্ট অর্থবরাদ্দের বিনিময়ে

চার্লসকে কয়েকটি দাবী সনদ মেনে নিতে বাধ্য করেন। পিটিশন অব রাইট (১৬২৮) নামে পরিচিত এই সনদের দ্বারা পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া শুল্কধার্য না করতে, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার না করতে চার্লস অঙ্গীকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই চার্চের সংস্কার, অবৈধ শুল্ক আদায় প্রভৃতি প্রশ্নে আবার পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে চার্লস পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে ১১ বছরের (১৬২৯-৪০) জন্য বিনা পার্লামেণ্টে দেশ শাসন করেন। এই সময় একচেটিয়া ব্যবসায়ের অনুমতি দানের বিনিময়ে তিনি অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ করেন। এর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে চার্লসের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। সর্বাপেক্ষা বেশী বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল নৌকর (ship-money) ধার্যের দ্বারা। এই করের বৈধতায় আপত্তি জানিয়ে মামলা করেন জন হ্যাম্পডেন। রাজানুগৃহীত বিচারকেরা করের বৈধতা মেনে নেয়।

চার্লসের দ্বারা নিযুক্ত ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ উইলিয়ম লর্ড পিউরিটানদের প্রতি কঠোর এবং ক্যাথলিকদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করায় ধর্মের ক্ষেত্রেও সংঘাত দেখা দেয়। অনেক পিউরিটান ইংলণ্ড ত্যাগ করে আমেরিকাতে বসতি স্থাপন করে। চার্লসের ধর্মনীতির ফলে স্কটল্যাণ্ডেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজনে আহূত পার্লামেণ্ট অর্থবরাদ্দে রাজী না হওয়ায় তিন সপ্তাহ পরেই পার্লামেণ্ট বাতিল করা হয়। এই পার্লামেণ্ট অল্পস্থায়ী পার্লামেণ্ট (Short-Parliament) নামে পরিচিত।

**গৃহযুদ্ধ**: এর পরে চার্লস নূতন পার্লামেণ্ট আহ্বান করলে ১৬৪০ থেকে ১৬৬০ পর্যন্ত সেই পার্লামেণ্ট বজায় ছিল। দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট (Long Parliament) নামে পরিচিত এই পার্লামেণ্টে জন পীম, হ্যাম্পডেন, অলিভার ক্রমওয়েল প্রভৃতি পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব দাবী করে পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার রাজার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। অবৈধ কর বাতিল, রাজার মন্ত্রীদের বিচার ও শাস্তিদান প্রভৃতি কাজের দ্বারা রাজার স্বার্থে আঘাত করায় চার্লস সসৈন্যে কমন্স সভায় গিয়ে পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে,

পার্লামেন্ট বাধা দেয় এবং বিপ্লবের ডাক ডাক দেয়। এর ফলে এবং পার্লামেন্টের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাতে শেষ পর্যন্ত চার্লস পরাজিত ও ধৃত হন। বিচারে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইংলণ্ডকে একটি কমনওয়েলথ বলে ঘোষণা করা হয়। পিউরিটান পন্থী পার্লামেন্টের নেতৃত্বে এই বিপ্লব হয় বলে এই বিপ্লব পিউরিটান বিপ্লব নামে খ্যাত।

**ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ ঃ** নূতন প্রজাতন্ত্রের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হয় ৪১ জন সদস্যের এক পরিষদের ওপর। সেনাবাহিনীর অধিকর্তা রূপে আসল ক্ষমতা থাকে অলিভার ক্রমওয়েলের হাতে। স্কট-ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে রাজতন্ত্রীদের পরাজিত করে ক্রমওয়েল পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত আইনসভার দ্বারা শাসন চালাতে চেষ্টা করেন। ১৬৫৩ সালে ইংলণ্ডের প্রবর্তিত হল প্রোটেক্টোরেট শাসনব্যবস্থা এবং ক্রমওয়েল চিরজীবনের জন্য প্রোটেক্টর বা শাসক নিযুক্ত হলেন। এর পর থেকেই শুরু হয় ক্রমওলের সামরিক শাসন। ক্রমে প্রোটেক্টর পদটিকে বংশানুক্রমিকও করা হয়। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুতে তাঁর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা প্রকৃত পক্ষে ভেঙ্গে পড়ে।


ক্রমওয়েল

**স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ** ক্রমওয়েলের পুত্র রিচার্ড পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেও শীঘ্রই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এক-

নায়কতন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে বিক্ষুব্ধ বিভিন্ন শ্রেণী রাজতন্ত্রকে স্বাগত জানায়। ১৬৬০ খ্রীঃ প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ইংলণ্ডের সিংহাসন আরোহণ করেন। দ্বিতীয় চার্লসও স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি সহানুভূতীশীল ছিলেন। তাঁর পঁচিশ বছরের রাজত্বকাল ধর্ম এবং আর্থিক প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্টের সঙ্গে বিরোধ হলেও তা সংঘর্ষে পরিণত হয়নি। কিন্তু চার্লসের মৃত্যুর পর ১৬৮৫ খ্রীঃ তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেম্‌স্ রাজা হলে পার্লামেণ্টের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় জেম্‌স্ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ও স্বৈরাচারী। পার্লামেণ্ট পাশ করা আইন স্থগিত রাখার অধিকার রাজার আছে বলে তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু অপুত্রক জেম্‌সের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রোটেস্ট্যাণ্ট কন্যা মেরী ও জামাতা হল্যাণ্ডের উইলিয়াম ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করবে এই আশায় পার্লামেণ্ট জেম্‌সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। ১৬৮৮ খ্রীঃ জেম্‌সের একটি পুত্র সন্তান হওয়ায় মেরীর সিংহাসন লাভের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। এই পুত্রও পিতার ন্যায় ক্যাথলিক ও স্বৈরাচারী হবে আশঙ্কায় পার্লামেণ্ট মেরী ও উইলিয়ামকে ইংলণ্ডের সিংহাসন দখলের জন্য আহ্বান জানায়। ১৬৮৮ খ্রীঃ উইলিয়াম ও মেরী সসৈন্যে ইংলণ্ডে উপস্থিত হলে দ্বিতীয় জেম্‌স্ ফ্রান্সে পালিয়ে যান। পার্লামেণ্ট উইলিয়াম ও মেরীকে সিংহাসন দান করে। উইলিয়াম বিনা বাধায় বিনা রক্তপাতে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। বিনা রক্তপাতে এই পরিবর্তন হয়েছিল বলে ইতিহাসে এই বিপ্লবকে রক্তপাতহীন বা গৌরবময় বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়।

**বিল অব রাইট্‌স্ঃ** উইলিয়াম ও মেরীকে সিংহাসন দান করার সময় পার্লামেণ্ট আপন অধিকার ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম রক্ষার জন্য একটি অধিকারের সনদ ঘোষণা করে। এই ঘোষণাই বিল অব রাইট্‌স্ নামে পার্লামেণ্টে প্রস্তাবিত হয়ে আইন রূপে গৃহীত হয়।

এই আইনে বলা হয় যে, ভবিষ্যতে কোন ক্যাথলিক ইংলণ্ডের

রাজা হবে না। ইংলণ্ডের রাজা অ্যাংলিকান চার্চের মতাবলম্বী হবে। পার্লামেণ্টের কোন আইনকে স্থগিত রাখার অথবা কোন প্রজাকে আইনের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার অধিকারও রাজার থাকবে না। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কর ধার্য করতে অথবা স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠন করতেও রাজা পারবেন না। পার্লামেণ্টের নির্বাচনে এবং স্বাধীন আলোচনাতেও রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

গৌরবময় বিপ্লব এবং বিল অব রাইটস্ এর দ্বারা ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং পার্লামেণ্টের ক্ষমতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের নিরাপত্তাও রক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাসে এই বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিসীম। অত্যাচারী রাজাকে বিতাড়িত করে নূতন রাজা স্থির করায় প্রজাদের অধিকারও স্বীকৃত হয়।

## অনুশীলনী

**১। সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) সপ্তদশ শতকে কোন্ তিনটি প্রধান কারণে রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ বাধে?

(খ) পিউরিটান বিপ্লবের পটভূমিকা এবং এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

(গ) সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব বা রক্তপাতহীন বিপ্লব বিষয়ে কি জান?

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) ক্রমওয়েল কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে ক্রমেনিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন? কত খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়?

(খ) বিল অব রাইট্স্ বলতে কি বোঝায়? এই বিলের মূল শর্ত কি ছিল?

৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) এলিজাবেথের পরে ১৬০৩ খ্রীঃ——স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা—— ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন।

(খ) প্রথমতঃ——এবং——উভয়েই মনে করতেন যে, রাজা ঈশ্বরের আশীর্বাদে ক্ষমতা লাভ করেছেন।

(গ) ১৬৮৮ খ্রীঃ——ও——সসৈন্যে ইংলণ্ডে উপস্থিত হলে—— ফ্রান্সে পালিয়ে যায়।

(ঘ) ——বণিকশ্রেণীর মধ্যে——বেশী প্রভাব ছিল।

৪। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) দ্বিতীয় জেমস্ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী।

(খ) ইংলণ্ডে টিউডর রাজবংশ স্থাপিত হবার সময়ে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধের সম্পর্ক ছিল।

(গ) জেম্সের ন্যায় চার্লসও ব্যক্তিগতভাবে সবার অপ্রিয় ছিলেন।

(ঘ) একনায়কতন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে বিক্ষুব্ধ বিভিন্ন শ্রেণী রাজতন্ত্রকে স্বাগত জানায়।

৫। **টীকা লিখ :**

ম্যাগনা কার্টা, দীর্ঘস্থায়ী পার্লামেণ্ট।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ভারতবর্ষ

**মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার :** ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা বাবর ছিলেন চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের বংশধর। ফরগণার শাসক ওমর শেখ মির্জার পুত্র বাবর ১৪৮৩ খ্রীঃ

জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু অচিরেই উজবেগ যোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি সমরখন্দ ও ফরগণা ছুইই হারান। ১৫০৪ খ্রীঃ কাবুল জয় করে তিনি ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখেন। ১৫১৯-২০ খ্রীঃ তিনি একবার ভারতে ব্যর্থ অভিযানও করেছিলেন।

**পানিপথের প্রথম যুদ্ধ :** ১৫২৫ খ্রীঃ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদি দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদির বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানান। উত্তর পশ্চিম ভারতের শাসকদের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগ নিয়ে বাবর ১৫২৬ খ্রীঃ ১২০০০ সৈন্য নিয়ে দিল্লী অভিযান করেন। পানিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদির বিপুল বাহিনীকে বাবরের স্বল্প সংখ্যক সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত সেনা পরাজিত করে। এই যুদ্ধে বাবর কামান ও গোলা-বারুদ ব্যবহার করায় তাঁর পক্ষে জয় সহজ হয়েছিল। এর ফলে বাবর দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য বাবরকে আরও ছুটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে সমগ্র রাজপুত জাতি বাবরের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হলে ১৫২৭ খ্রীঃ বাবর খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজিত করেন। ১৫২৯ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ আফগান শক্তিকেও গোগরার যুদ্ধে তিনি পরাজিত করেন। পানিপথ, খানুয়া এবং গোগরার যুদ্ধের ফলেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।



বাবর

**হুমায়ুন ও শেরশাহ :** ১৫৩০ খ্রীঃ বাবরের মৃত্যুর পরে তাঁর

জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন সিংহাসন লাভ করেন। যোগ্য শাসক হলেও তিনি ছিলেন আরামপ্রিয়। গোগরার যুদ্ধে আফগান শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি। পূর্বাঞ্চলে শেরখাঁর নেতৃত্বে আফগানরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিল। শেরখাঁ প্রথম থেকেই হুমায়ুনকে বিব্রত করতে থাকেন। হুমায়ুন কালিঞ্জর দুর্গ জয় করে শেরখাঁর অধিকৃত চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। সাময়িক ভাবে শের খাঁ বশ্যতা স্বীকার করলেও অন্যত্র হুমায়ুনের ব্যস্ততার সুযোগে দ্রুত নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে গৌড় অবরোধ করেন। হুমায়ুন শেরখাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে ১৫৩৯ খ্রীঃ চৌসার এবং ১৫৪০ খ্রীঃ বিলগ্রামের (কনৌজের) যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। শের খাঁ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে শেরশাহ নামে পাঁচ বছর রাজত্ব করেন।

সুযোগ্য শাসক শেরশাহ পাঁচ বছরের রাজত্বে বহু জনহিতকর সংস্কার করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা, উদার ধর্মনীতি প্রভৃতি ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে।

শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হন। ১৫৫৬ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুতে আকবর দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন।

আকবর: মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ১৫৪২ খ্রীঃ হুমায়ুন যখন ভাগ্যের সন্ধানে ভ্রাম্যমান, তখন অমরকোটে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৫৬ খ্রীঃ মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি সিংহাসন লাভ করে প্রথম কয়েক বছর বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে থাকেন। রাজত্বের প্রথম বছরেই শূরবংশীয় সুলতান মহম্মদ আদিল শাহের হিন্দুমন্ত্রী হিমু দিল্লী অধিকার করলে আকবর ও বৈরাম খাঁ হিমুর আফগান বাহিনীকে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬) পরাজিত করে পুনরায় দিল্লী দখল করেন। ১৫৬০ খ্রীঃ আকবর নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করেন।

আকবর ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। ১৫৬০-৬১ খ্রীঃ-এর মধ্যে আকবর গোয়ালিয়র, আজমীর, জৌনপুর ও মালব জয় করেন।

১৫৬২ খ্রীঃ অম্বরের রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন। গণ্ডোয়ানার রাণী দুর্গাবতী সপুত্র আকবরের কাছে পরাজিত ও নিহত হন।


আকবর

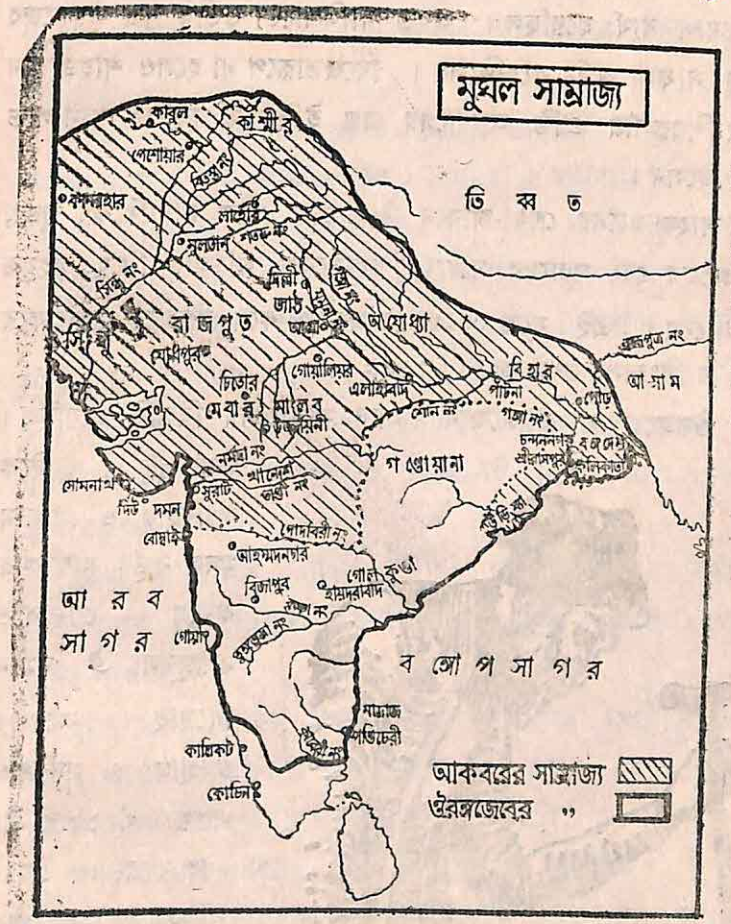
রাজপুতানার অনেক শাসক আকবরের বশ্যতা স্বীকার করলেও চিতোর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেনি। পরে চিতোর দখল করলেও চিতোরের রাণা উদয় সিংহ মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেননি। উদয় সিংহের পরে তাঁর পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ মুঘল শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হন। ১৫৭৬ খ্রীঃ আকবর মানসিংহ ও আসফ খাঁর নেতৃত্বে প্রতাপের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী পাঠান। হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। মৃত্যুর আগে চিতোর ছাড়া প্রায় সমগ্র হৃত অঞ্চলই তিনি পুনরায় দখল করতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে আকবর ১৫৭২ খ্রীঃ গুজরাট এবং ১৫৭৬ খ্রীঃ-এর মধ্যে বাংলা বিহার-উড়িষ্যা মুঘল অধীনে আনেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও আকবর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। ১৫৮১ থেকে ১৫৯৫-এর মধ্যে কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ, কান্দাহার ও বেলুচিস্তান আকবরের অধীনে আসে।

দাক্ষিণাত্যেও প্রসারিত হয়েছিল আকবরের বিজয় বাহু। প্রবল প্রতিরোধের পর আহমদনগরের রাণী চাঁদসুলতানাকে পরাজিত করে আকবর আহমদনগর জয় করেন। খান্দেশের সুলতান মুঘল আনুগত্য অস্বীকার করে আসীরগড় দুর্গে আশ্রয় নিলে আকবর ১৬০১ খ্রীঃ দীর্ঘদিন অবরোধের পরে আসীরগড় জয় করেন। এর

পরে আকবর আর কোন রাজ্য জয় করেন নি। ১৬০৫ খ্রীঃ আকবরের মৃত্যু হয়।

শুধু বিজেতাই নয়, অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আকবর বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে স্থায়িত্বও দিয়েছিলেন। তাঁর দীন-ই-ইলাহি ধর্মমত ধর্ম বিষয়ে তাঁর উদারতার পরিচায়ক।




**জাহাঙ্গীর:** আকবরের পরে সেলিম জাহাঙ্গীর নামে সম্রাট হন। তাঁর সময়ে মেবারের রাণা অমর সিং মুঘল আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৬১২ খ্রীঃ বাংলার আফগানদের বিদ্রোহ এবং ১৬১৩ খ্রীঃ আহমদনগরের বিদ্রোহ তাঁর সময়ে দমন করা হয়। কাংড়া ও

কামরূপও মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। জাহাঙ্গীরের সময়ে সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

**শাহাজাহান**ঃ ১৬২৭ খ্রীঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে যুবরাজ খুরম শাহজাহান নাম নিয়ে সম্রাট হন। শাহজাহান সফল বিজেতা ছিলেন না। উত্তর-পশ্চিমে কান্দাহার, বল্‌খ ও বদখশানে তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। অবশ্য দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব কিছু সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বিজেতারূপে না হলেও শাহজাহান তাঁর শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের জন্য ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন।

শাহজাহানের শেষ জীবনে তাঁর চার ছেলে দারাসিকো, সুজা, ঔরঙ্গজেব এবং মুরাদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব জয়লাভ করে পিতাকে বন্দী করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন (১৬৫৯)।

**ঔরঙ্গজেব**ঃ ঔরঙ্গজেবের সময়ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব দিকে কুচবিহার ও আসাম মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে সেনাপতি মীরজুমলা ঐ দমনে বিদ্রোহ করেন। চট্টগ্রাম ও সন্দীপও শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৬ খ্রীঃ দখল করেন। উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দশ বছর ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে ১৬৭৪ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেব পেশোয়ার দখল করে সমগ্র অঞ্চলটিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। রাজস্থানে মারোয়াড়ের রাজা



ঔরঙ্গজেব

যশোবন্তরাও-এর মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব মারোয়াড় দখলের চেষ্টা করায় রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬৮১ খ্রীঃ মেবারের রাণার সঙ্গে চুক্তি হলেও মারোয়াড়ের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে এই বিরোধের অবসান হয়।

জীবনের শেষ পঁচিশ বছর ঔরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর রাজ্য দুটি দখল করলেও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের উত্থান ঔরঙ্গজেবকে বিব্রত করে তোলে।

**মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ** মুঘল যুগের সমাজ ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। সম্রাটের পরেই মর্যাদার স্থান ছিল আমীর-ওমরাহদের। আড়ম্বর ও বিলাসে জীবন কাটাতেই তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। উচ্চ-পদেও তাঁরাই নিযুক্ত হতেন। বণিক, মহাজন, চিকিৎসক প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বিলাসিতায় না হলেও তাঁরা আরামেই জীবন কাটাতেন। দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষক ও শ্রমজীবী। বঞ্চনা ও বিড়ম্বনাই ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ।

হিন্দু সামাজিক রীতি নীতি ছিল কঠোর। সতীদাহ, বাল্য-বিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা ইত্যাদি নিয়ম হিন্দু সমাজের অবক্ষয় সূচিত করে।

মুঘল যুগে মোটের উপর হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বজায় ছিল। আকবরের ধর্মনীতি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সৌহার্দ্যের সৃষ্টি করেছিল ঔরঙ্গজেবের সময়েও তা বিনষ্ট হয়নি।

জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ। কৃষকদের উপর অত্যাচার ও শোষণ আগের মতই ছিল। শেরশাহ ও আকবরের সময়ে জমি জরিপের দ্বারা জমিতে কৃষকের অধিকার ও খাজনা নির্দিষ্ট করে কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল।

শিল্পকার্যও অনেকের জীবিকা ছিল। প্রধান শিল্প ছিল বস্ত্র শিল্প। বাংলার মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। কাশ্মীরে উৎপন্ন হত পশমী বস্ত্র। বিলাস এবং উপভোগের সামগ্রীই বেশী। উৎপাদিত হত বিদেশে রপ্তানি এবং অভিজাতদের ভোগের জন্য। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের দ্বারা। দ্রব্যমূল্য কম থাকলেও ক্রয়-ক্ষমতা না থাকায় প্রজারা তার সুবিধা ভোগ করতে পারেনি। প্রাচুর্য মুঘলযুগে অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা ভোগ করত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরা। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রচুর।

বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণঃ মুঘল যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পেশার অনেক ভ্রমণকারী ভারত পরিভ্রমণ করে বিবরণ রেখে গিয়েছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এই সকল বিবরণ সব সময় সঠিক না হলেও অনেক তথ্য এগুলি থেকে পাওয়া যায়। ইংরেজ ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফিচ্ আকবরের সময়ে বিভিন্ন নগরের সমৃদ্ধি এবং বাংলা ও উত্তর ভারতের মধ্যে বিপুল বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পর্তুগীজ মিশনারী ফাদার মনস্থুরেটের বিবরণ থেকে আকবরের ধর্মমত সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন হকিন্স এরং টমাস রো এসেছিলেন ইংলণ্ড থেকে জাহাঙ্গীরের সময়। হকিন্সের বিবরণ থেকে জাহাঙ্গীরের দরবারে আড়ম্বরের এবং রো-র বিবরণ থেকে প্রাদেশিক কর্মচারীদের অপশাসন সম্পর্কে জানা যায়।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক ভ্রমণকাহিনী বার্ণিয়ের ছিলেন একজন ফরাসী ডাক্তার। শাহজানের সময়ে ভারতের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করে সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এক মূল্যবান বিবরণ তিনি দিয়েছেন। কৃষকদের দুরবস্থা এবং রাজকর্মচারীদের অত্যাচার সম্পর্কে বহু কাহিনী এই বিবরণ থেকে জানা যায়। মুঘল যুগে শিল্প সম্পর্কেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা ছিল তখন সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল।

এ ছাড়াও ট্যাভার্নিয়ার, নিকোলো, মানুচি প্রভৃতি কয়েকজন বৈদেশিক ভ্রমণকারীও অনেক তথ্য রেখে গিয়েছেন।

**মুঘল সাম্রাজ্যের পতন**ঃ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিক থেকেই সাম্রাজ্যের পতনের লক্ষণ দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ। ১৭০৭ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে পতনের গতি দ্রুততর হয়। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটেরা কেউই যোগ্য ছিলেন না। তাঁদের অযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করেছিল ওমরাহরা। বাহাদুর শাহের চার ছেলের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধে জ্যেষ্ঠপুত্র জাহান্দার সফল হয়েছিলেন। ১৭১৩ খ্রীঃ তিনি নিহত হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুখশিয়র দুইজন ক্ষমতাশালী ওমরাহের (সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়) সাহায্যে সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি পদচ্যুত ও নিহত হন। সৈয়দরা মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষমতা ভোগ করতে থাকেন। বিলাসপ্রিয় হলেও মহম্মদ শাহ শেষ পর্যন্ত সৈয়দদের ক্ষমতা খর্ব করতে সক্ষম হন। কিন্তু নাদীর শাহের আক্রমণ মুঘল শক্তিকে আরও দুর্বল করে দেয়। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে একের পর এক প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় আনুগত্য স্বীকার করে। দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, বাংলা সম্রাটের হাতছাড়া হয়ে যায়। রাজপুত, শিখ, মারাঠা, রোহিলাগণ নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন হয়ে ওঠে।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আহম্মদ শাহ সম্রাট হন (১৭৪৮-৫৪)। তাঁর সময়ে নাদির শাহের সেনাপতি আহম্মদ শাহ আবদালী পাঞ্জাব জয় করেন। বস্তুত আবদালীর আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। পরবর্তী সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫০-৫১) ও দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) নামে মাত্রই সম্রাট ছিলেন। ইতিমধ্যে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরাজরা বাংলা দেশে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজদের জয়লাভের ফলে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরাজদের বৃত্তি ভোগীতে

পরিণত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের পরে মুঘল রাজবংশ অপসারিত হয়ে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব স্থাপিত হয়।

## ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

**পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ** ১৫৯৮ খ্রীঃ পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। এর পরেই পর্তুগীজ বণিকরা ভারতে বাণিজ্য-বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। ভারতের গোয়া, দমন, দিউ, সলিসেটি, বেসিন, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রমশঃ পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজ প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন আলবুকার্ক।

পর্তুগীজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইংরাজ, ওলন্দাজ ফরাসী, প্রভৃতি জাতির বণিকরাও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আসতে থাকে। ভারতের সাথে বাণিজ্য নিয়ে এইসব ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের সাথে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে পর্তুগীজদের প্রাচ্যদেশীয় সাম্রাজ্য গোয়া, দমন ও দিউ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওলন্দাজরাও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভেতর অন্যান্য জাতির বণিকদের তুলনায় ইংরাজ এবং ফরাসীরা ভারতে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে ভারতে ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্য কুঠিগুলি ছিল কলকাতা, কাশিমবাজার, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে। পক্ষান্তরে পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি স্থানসমূহে ছিল মুখ্য ফরাসী বাণিজ্যকুঠি। ১৭৪১ খ্রীঃ ডুপ্লের নেতৃত্বে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায় ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ব্যর্থ হয়।

**ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধঃ** ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব প্রধানত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে করমণ্ডল উপকূলে। এখানে মাদ্রাজ ছিল ইংরাজদের আর পণ্ডিচেরী ছিল ফরাসীদের প্রধান ঘাঁটি। প্রায় পনেরো বছর

ধরে এই বিরোধে তিনটি যুদ্ধ হয়েছিল। এগুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। প্রথম কর্ণাট যুদ্ধে ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা কিছু সাফল্য অর্জন করলেও আয়-লা-চ্যাপেলের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। দাক্ষিণাত্যের ভারতীয় রাজন্যবর্গের গৃহবিবাদকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪) শুরু হয়। এই যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের দূরদর্শিতায় ইংরাজরা সাফল্যের সাথে ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধাবসানের পর হায়দরাবাদে ফরাসীদের এবং কর্ণাটে ইংরাজদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৫৬ খ্রীঃ ইউরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতে তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বন্দীবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) ইংরাজ সেনাপতি আয়ার কূটের হাতে ফরাসী গভর্ণর লালীর গুরুতর পরাজয়। ১৭৬৩ খ্রীঃ ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হলে ভারতেও উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ফরাসীরা তাদের উপনিবেশগুলি ফেরৎ পেলেও এই পরাজয়ের ফলে ভারতে ফরাসী প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট হল।

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরাজদের জয়লাভের ফলে ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম হয়, ফরাসীদের পরাজয়ের ফলে বাংলায় আধিপত্য স্থাপনের ব্যাপারে ইংরাজরা অধিকতর মনযোগ দিতে পেরেছিল।

**মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান:** সপ্তদশ শতকে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুথান ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাহাড়, নদী ও সমুদ্র দিয়ে সুরক্ষিত মহারাষ্ট্রে শিবাজীর আগে থেকেই ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাবে জাতীয় ঐক্যবোধের চেতনা দেখা দিয়েছিল। শিবাজীর নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক প্রতিভা মারাঠা-দের এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছিল।

**শিবাজী ঃ** ১৬৩০ ( মতান্তরে ১৬২৬ ) খ্রীষ্টাব্দে জুনারের কাছে শিবনের দুর্গে শিবাজীর জন্ম। পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে আহমদনগর ও পরে বিজাপুরের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। মা জীজাবাঈ এবং দাদাজী কোণ্ডদেব নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে শিবাজীর বাল্যকাল কেটেছিল। এই সময় তিনি এক স্বাধীন হিন্দুধর্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হন।

শিবাজী ১৬৪৫ খ্রীঃ বিজাপুরের কাছ থেকে তোর্ণা দখল করে তার পাঁচ মাইল দূরে রায়গড় দুর্গ নির্মাণ করেন। কল্যাণ দুর্গটি দখল করলে বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দী করেন। কয়েক বছর চুপচাপ থেকে শাহজীর মুক্তির পরে শিবাজী পুনরায় ১৬৫৬ খ্রীঃ জাওলী দখল করেন এবং পরের বছর আহমদনগর ও জুনার লুঠ করেন। এর ফলে বিজাপুর ও মুঘলদের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষ শুরু হয়। বিজাপুরের সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেও প্রতাপগড় দুর্গ দখলে ব্যর্থ হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। আলোচনার সময় শিবাজী কৌশলে আফজল খাঁকে হত্যা করে তাঁর সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করেন। কোঙ্কণ এবং কোলাপুরও শিবাজী অধিকার করেন। কয়েকটি অভিযানের ব্যর্থতার ফলে বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন।



শিবাজী

মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৬০ খ্রীঃ শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠান। শায়েস্তা খাঁ পুণে, চাকান, কল্যাণ অধিকার করলেও শিবাজীর অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত হয়ে আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরের বছর শিবাজী সুরাট লুঠ করে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন।

এরপর শিবাজীর বিরুদ্ধে মুঘল সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে পাঠান হয়। পরাজিত হয়ে শিবাজী ১৬৬৫ খ্রীঃ পুরন্দরের সন্ধি করেন। কিছুদিন পরে ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে পুত্র শম্ভুজীকে নিয়ে দিল্লী গেলে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। শিবাজী কৌশলে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। ১৬৭০ খ্রীঃ মুঘলদের সঙ্গে শিবাজীর পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। একে একে পুরন্দরের সন্ধিতে হারানো সব দুর্গ দখল করে শিবাজী সুরাট বন্দরের উপরে যৌথ দাবি করেন।

১৬৭৪ খ্রীঃ রায়গড়ে শিবাজীর অভিষেক হয় এবং তিনি ছত্রপতি উপাধি ধারণ করেন। ১৬৮০ খ্রীঃ শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভুজী মারাঠা সিংহাসন লাভ করেন। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে ১৬৮৯ খ্রীঃ তিনি পরাজিত ও বন্দী হলে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর পুত্র শম্ভুও বন্দী হন। শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভাই রাজারামের সিংহাসন লাভ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। ১৭০১ খ্রীঃ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে শাহু মুক্তি লাভ করলে রাজারাম পুত্র তৃতীয় শিবাজী ও শাহুর মধ্যে সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ দেখা দেয়।

**বালাজী বিশ্বনাথ :** বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় শাহু জয় লাভ করেন এবং বালাজীকে পেশোয়া নিযুক্ত করেন। শাহু ছিলেন নামে রাজা, সকল ক্ষমতা ছিল বালাজীর হাতে। এই সময় থেকে পেশোয়া পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। বালাজী ছিলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় স্থাপয়িতা। মুঘল সম্রাটের সঙ্গে ১৭১৪ খ্রীঃ এক সন্ধি করে দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য এবং মুঘল দরবারে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি তিনি বৃদ্ধি করেছিলেন।

**প্রথম বাজীরাও :** তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া হন। মালব ও গুজরাটে তিনি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। নিজাম ১৭৪১ খ্রীঃ এক সন্ধির দ্বারা উত্তর ভারতে পেশোয়ার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন।

**বালাজী বাজীরাওঃ** ১৭৪০ খ্রীঃ প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া হন। তাঁর সময়েও মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল। নিজামকে পরাজিত করে আহমদনগর, বুরহানপুর, দৌলতাবাদ, ও বিজাপুর তিনি লাভ করেছিলেন। বেরারের মারাঠা নেতা ভোঁসলে উড়িষ্যা জয় করে বাংলার নবাব আলিবর্দীর কাছ থেকে চৌথ আদায় করেন। কিন্তু ১৭৬১ খ্রীঃ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহম্মদ শাহ আবদালির কাছে পরাজিত হলে মারাঠা শক্তি সাময়িক ভাবে বিনষ্ট হয়। পেশোয়া বালাজী বাজীরাও ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

বালাজী বাজীরাও-এর ছেলে পেশোয়া প্রথম মাধব রাও-এর সময় মারাঠা শক্তির পুনরুত্থান হয়েছিল। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হলে আত্মকলহে মারাঠা শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

**শিখশক্তির উত্থানঃ** পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে নানক শিখধর্ম প্রচার করেন। নানকের সময় থেকে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত মোট দশজন শিখগুরু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে শিখ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেছেন। প্রথমে শিখগণ ছিল শান্তিকামী একটি ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায়। কিন্তু ষষ্ঠ গুরুগোবিন্দের সময় সপ্তদশ শতকে শিখগণ একটি সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের সময় শিখগণ একটি শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। গোবিন্দসিংহই বিখ্যাত 'খালসা' বাহিনীর স্রষ্টা। তিনিই নিয়ম করেন যে প্রত্যেক শিখ কেশ, কাঁকই ( চিরুণী ), কঙ্কণ, কৃপাণ এবং কচ্ছ ধারণ করবে। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পরে গুরু পদটি পরিত্যক্ত হয়।

মুঘল শাসনের পতনের যুগে শিখগণ শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ( ১৭৬১ ) পরে পাঞ্জাবে শিখ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৩ সালের মধ্যে পূর্বে সাহারানপুর থেকে পশ্চিমে আটক পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে শিখদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। এই সময়ে শিখরা ১২টা মিশিল বা সামন্তরাজ্যে বিভক্ত

ছিল। মিছিলগুলির পারস্পরিক কলহে দুর্বল শিখরাজ্যকে রক্ষা করেন রণজিৎ সিংহ।

**রণজিৎ সিংহ ঃ** ১৭৮০ খ্রীঃ রণজিৎ সিংহের জন্ম। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুতে তিনি সুকার চুকিয়া মিশিলের অধিপতি হন। ১৭৯৮ খ্রীঃ কাবুলের অধিপতি জামান শাহের পাঞ্জাব আক্রমণের সময়ে রণজিৎ সিংহ নিরপেক্ষ থাকায় তাঁর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে রাজা উপাধি পান। জামান শাহের প্রত্যাবর্তনের পরে রণজিৎ সিংহের সামরিক সাফল্য শুরু হয়। একে একে লাহোর, অমৃতসর ও লুধিয়ানা জয় করে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পশ্চিমতীরের শিখ মিশিলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। জম্মুর রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। শতদ্রু নদীর পূর্বতীরের শিখ মিশিলগুলি রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। ১৮০৮ খ্রীঃ লর্ড মিণ্টো রণজিৎ সিংহের দরবারে চার্লস মেটকাফকে আলোচনার জন্য পাঠান। কিন্তু রণজিৎ সিংহ মেটকাফের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত না হয়ে শতদ্রুর পূর্বতীরের শিখরাজ্যগুলি আক্রমণ করলে বিপুল ইংরাজ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন রণজিৎ সিংহ ১৮০৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ইংরাজদের সঙ্গে অমৃতসরে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শতদ্রু নদী উভয়ের মধ্যে সীমারেখা বলে স্বীকৃত হয়।



রণজিৎ সিংহ

পূর্বদিক বিস্তারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় রণজিৎ সিংহ অন্যদিকে মনোনিবেশ করেন। ১০ বছরের মধ্যে কাংড়া, আটক, মুলতান ও কাশ্মীর তাঁর অধীনে আসে। ১৮৩১ খ্রীঃ বেন্টিক পুনরায় অমৃতসরের সন্ধিকে স্বীকার করে মৈত্রী স্থায়ী করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়।

রণজিৎ সিংহ শুধু সামরিক নেতাই ছিলেন না, তিনি একজন বিচক্ষণ ও সহিষ্ণু শাসকও ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে কোন ভেদাভেদ তাঁর রাজ্যে ছিল না। কূটনীতিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। অমৃতসরের চুক্তির দ্বারা শিখরাজ্য রক্ষা তাঁর কূটনীতির সাফল্যের সাক্ষ্য দেয়। ইংরাজদের সঙ্গে পরবর্তী শিখদের মৈত্রী সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে ১৮৪৯ খ্রীঃ ইংরেজরা পাঞ্জাব দখল করে নেয়।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কার কার সাথে হয়েছিল? এই যুদ্ধের বিবরণ দাও ও ফলাফল বর্ণনা কর।

(খ) মুঘল সম্রাট আকবরের বাল্যকাল ও সাম্রাজ্য বিস্তার বর্ণনা কর।

(গ) সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

(ঘ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি কি কি?

(ঙ) শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থানের বিবরণ দাও।

(চ) রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখ শক্তির অভ্যুত্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কার বংশধর? মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? কেন তাঁকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়?

(খ) সৌন্দর্যপ্রিয়, প্রেমিক ও বিলাসী সম্রাট হিসেবে মুঘল বংশে কার খ্যাতি ছিল বেশি? তাঁর বিলাসিতা আর সৌন্দর্যপ্রিয়তার কয়েকটি নিদর্শন দাও।

(গ) কোন্ সম্রাটের আমলে মুঘল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ করে? কোন্ সম্রাটের মৃত্যুর পর থেকে মুঘল বংশ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়?

(ঘ) শের খাঁ কতদিন রাজত্ব করেন? কোন্ কোন্ যুদ্ধে কোন্ মুঘল সম্রাটকে তিনি পরাজিত করেন?

৩। **সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) ১৫২৭ খ্রীঃ আকবর খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজিত করেন।

(খ) রাণা প্রতাপ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চিতোর ছাড়া আর কোন অঞ্চলই দখল করতে পারেন নি।

(গ) ইংলণ্ড থেকে টমাস রো এসেছিলেন সম্রাট শাজাহানের আমলে।

(ঘ) ১৬৩০ খ্রীঃ জুনারের কাছে শিবনের দুর্গে শিবাজীর জন্ম।

(ঙ) ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) ফরগণার শাসক তৈমুরলঙ-এর/ওমরশেখ মির্জার/চেঙ্গিস খাঁর পুত্র ছিলেন বাবর।

(খ) পাণিপথের যুদ্ধ হয়েছিল বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর/দৌলত খাঁ লোদির/শের খাঁর।

(গ) গণ্ডোয়ানার রাণী লক্ষ্মীবাই/দুর্গাবতী/চাঁদ সুলতানা আকবরের কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

(ঘ) ১৬২৭ খ্রীঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে যুবরাজ খুরম/দারাসিকো/মুরাদ দিল্লীর সম্রাট হন।

৫। **টীকা লিখ :**

ক) রাণা প্রতাপ খ) বালাজী বাজীরাও গ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।

———

সপ্তম অধ্যায়

# ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

**প্রথম পর্যায়ঃ** কর্ণাটের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ বাণিজ্যের নিরাপত্তা রক্ষিত হয়েছিল। ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের সুযোগও ইংরাজরা পেয়েছিল। বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, মীরজাফর প্রভৃতি ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রে ইংরাজরাও অংশ গ্রহণ করে। নবাবের বিনা অনুমতিতে কলকাতায় তুর্গ নির্মাণ করে এবং বিনাশুল্কে ব্যবসা করার 'দস্তকে'র অপব্যবহার করেও ইংরাজরা নবাবের বিরাগ ভাজন হন। নবাব কলকাতা আক্রমণ করে দখল করলেও কিছুদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের নেতৃত্বে পাঠানো ইংরাজ বাহিনী কলকাতা দখল করে হুগলী লুঠ করে। আলিনগরের সন্ধি দ্বারা (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭) শান্তি স্থাপিত হয়। ইংরাজরা কলকাতায় তুর্গ নির্মাণের অনুমতি সহ বিভিন্ন সুবিধা লাভ করে।

আলিনগরের সন্ধি সাময়িক শান্তি স্থাপন করলেও সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অবসান হয়নি। সিরাজকে অপসারিত করে মীরজাফরকে মসনদে বসাবার ষড়যন্ত্রে ক্লাইভ যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ২৩ শে জুন ১৭৫৭, পলাশী গ্রামে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ পরাজিত হন এবং পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়েন ও নিহত হন। বাংলার মসনদে মীরজাফরকে বসান হয়। এই সময় থেকেই বাংলায় ইংরাজ প্রাধান্যের সূত্রপাত। ইংরাজরা হয় নবাবী দেওয়া-নেওয়ার কর্তা। নবাব ইংরাজদের ক্রীড়নকে পরিণত হন।



রবার্ট ক্লাইভ

কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী ও কর্মচারীদের অর্থের দাবী মেটাতে না পারায় মীরজাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাই মীরকাশিমকে ১৭৬০ খ্রীঃ ইংরাজরা বাংলার মসনদে বসায়।

স্বাধীনচেতা মীরকাশিম ইংরাজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য অবাধ্য কর্মচারী ও জমিদারদের দমন করে সৈন্যবাহিনীকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলেন। মীরকাশিমের শক্তিবৃদ্ধিতে ইংরাজ কোম্পানী শঙ্কিত হয়। বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অধিকারের অপব্যবহারের প্রশ্নে ইংরাজদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ শুরু হলে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, উদয়নালা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হয়ে মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা এবং মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে একযোগে বক্সারে ইংরাজদের সম্মুখীন হন। কিন্তু ১৭৬৪ খ্রীঃ বক্সারে পরাজয়ের ফলে তাঁর শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বক্সারের জয়ের ফলে বাংলায় ইংরাজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অযোধ্যার নবাবও ইংরেজদের প্রভাবাধীন হন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ১৭৬৫ খ্রীঃ এক সন্ধির দ্বারা ইংরাজদের বাংলার দেওয়ানী কর্তৃত্ব দান করেন এবং নিজে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন।

**ওয়ারেন হেষ্টিংস** : ১৭৭২ খ্রীঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলায় কোম্পানীর গভর্ণর হয়ে আসেন। তখন কোম্পানীর বাংলা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তিনজন গভর্ণর ছিল। ১৭৭২ খ্রীঃ রেগুলেটিং এ্যাক্টের দ্বারা বাংলার গভর্ণরকে গভর্ণর-জেনারেল করে বোম্বে এবং মাদ্রাজের গভর্ণরদের তাঁর অধীনে আনা হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে ভারতে কোম্পানীর রাজ্যের প্রসার ঘটে। তাঁর সময় মারাঠাদের সঙ্গে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠি যুদ্ধ,



ওয়ারেন হেষ্টিংস

মহীশূরের সঙ্গে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ হয়। অযোধ্যার নবাবের রোহিলাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে হেষ্টিংস ৪০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। ১৭৮৪ খ্রীঃ মাঙ্গালোরের সন্ধির দ্বারা ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়।

**কর্ণওয়ালিস ঃ** পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিসের ( ১৭৮৬-৯২ ) সময় তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে ( ১৭৮৯-৯২ ) টিপু সুলতান পরাজিত হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিতে রাজ্যের অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ইংরাজ, মারাঠা ও নিজাম অঞ্চলগুলি ভাগ করে নেয়।

**ওয়েলেসলী ঃ** লর্ড ওয়েলেসলীর ( ১৭৯৮-১৮০৫ ) সময় কোম্পানীর আধিপত্যের বিশেষ বিস্তার ঘটে। মহীশূরেও মারাঠা শক্তি তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে ওয়েলেসলী অধীনতা মূলক মিত্রতার নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতিতে বলা হয় যে, কোন রাজ্য এই নীতি গ্রহণ করলে ইংরাজ সেই রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করবে। বিনিময়ে সেই রাজ্য একটি ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার গ্রহণ করবে এবং অন্য কোন ইউরোপীয় জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। লর্ড ওয়েলেসলী এই নীতির প্রয়োগ করে কোম্পানীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রথমে হায়দারাবাদের নিজাম এবং পরে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এই নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু টিপু সুলতান এবং অন্যান্য মারাঠা নেতৃবর্গ এই নীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ ফরাসীদের সঙ্গে টিপুর যোগাযোগ এবং সামরিক প্রস্তুতির অজুহাতে ওয়েলেসলী টিপুর বিরুদ্ধে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ করেন। টিপু যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে মহীশূর রাজ্যের ওপর ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।


ওয়েলেসলী

১৮০৩ খ্রীঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, হোলকার এবং পেশোয়ার রাজ্যে কোম্পানীর প্রভাব বিস্তৃত হয়। এছাড়াও কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা, উত্তরাধিকারের গোলযোগের সুযোগে তাঞ্জোর, টিপুকে সাহায্যের অপরাধে কর্ণাটকও কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এইভাবে ছয় সাত বছরের মধ্যে ওয়েলেসলী ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

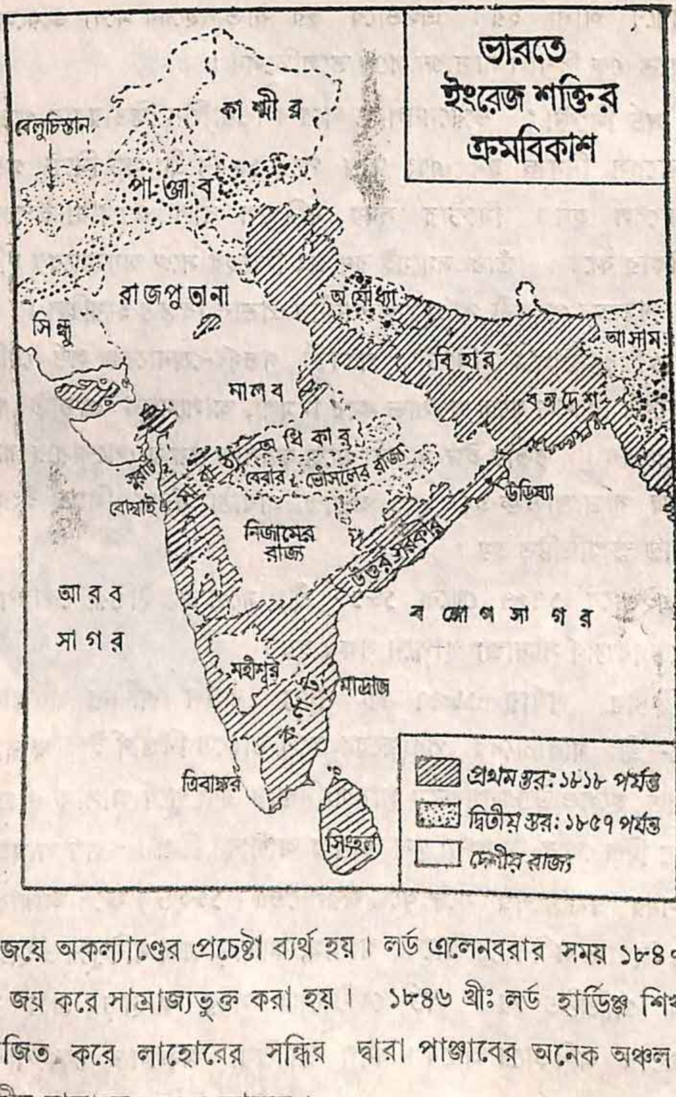
**লর্ড মিণ্টো :** ওয়েলেসলীর পরে কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয়বার গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং তার পরে ১৮০৭ খ্রীঃ লর্ড মিণ্টো গভর্ণর জেনারেল হন। মিণ্টোর সময় মরিশাস দ্বীপ ও গোয়া ইংরেজরা অধিকার করে। তাঁর সময়েই রণজিৎ সিংহের সঙ্গে অমৃতসরের চুক্তির দ্বারা শতদ্রুর পূর্ববর্তী পর্যন্ত কোম্পানীর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

**লর্ড হেষ্টিংস :** মিণ্টোর পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে সিমলা, আলমোড়া প্রভৃতি স্থান লাভ করেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে জয়লাভ করায় পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং অন্যান্য মারাঠা রাজ্যগুলিতে ইংরাজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এইভাবে ১৭৫৭ থেকে ১৮১৮ খ্রীঃ মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়।

**দ্বিতীয় পর্যায়—১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বৃটিশ শক্তির বিস্তার :** ১৮১৮ খ্রীঃ মারাঠাদের পরাজয়ের ফলে ভারতে বিস্তীর্ণ ইংরাজ রাজ্য স্থাপিত হলেও উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান এবং পূর্বে আসাম ও ব্রহ্ম-দেশের দিক থেকে নিরপত্তা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। লর্ড আমহার্ষ্ট এর সময় ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের ( ১৮২৬ ) ফলে আরাকান অঞ্চল ইংরাজ অধিকারে আসে। আসাম, কাছাড় এবং মণিপুরেও ইংরাজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড বেন্টিংকের সময় কাছাড় এবং কুর্গ ইংরাজদের অধিকারে আসে। ফলে জয়ন্তিয়া অঞ্চলেও কোম্পানীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে পূর্ব সীমান্ত নিরাপদ হলেও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তার অভাব ছিল।

**আফগান যুদ্ধ :** লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করার জন্য আফগানিস্তানের সিংহাসনে দোস্ত মহম্মদের পরিবর্তে শাহ সুজাকে বসাবার প্রচেষ্টার ফলে প্রথম ইঙ্গ-আফগান ( ১৮৩৯ ) যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনীর শোচনীয়




পরাজয়ে অকল্যাণ্ডের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। লর্ড এলেনবরার সময় ১৮৪০ খ্রীঃ সিন্ধু জয় করে সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ১৮৪৬ খ্রীঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদের পরাজিত করে লাহোরের সন্ধির দ্বারা পাঞ্জাবের অনেক অঞ্চল এবং কাশ্মীর সাম্রাজের মধ্যে আনেন।

**লর্ড ডালহৌসী :** ১৮৪০ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের

গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড ডালহৌসী। তাঁর সময়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রসার হয়েছিল। তাঁর সময়ে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে শিখদের পরাজয়ের ফলে ১৮৪৯ খ্রীঃ সমগ্র পাঞ্জাব ইংরাজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ ডালহৌসী সিকিম দখল করেন এবং ১৮৫২ খ্রীঃ দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু ইংরাজ দখলে আসে। তাছাড়া স্বত্ব বিলোপ নীতির দ্বারাও ডালহৌসী অনেক অঞ্চল দখল করেছিলেন। স্বত্ব বিলোপ নীতির দ্বারা বলা হয় যে ইংরাজদের আশ্রিত কোন দেশীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকলে রাজার মৃত্যুর পরে সেই রাজ্য কোম্পানীর অধীনে চলে যাবে। বিনা অনুমতিতে গৃহীত দত্তক পুত্রের অধিকারও স্বীকৃত হবে না। এই নীতির ফলে সাঁতারা, নাগপুর, ঝাঁসী, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য ডালহৌসী দখল করেন। কর্ণাটক, তাঞ্জোর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যকেও নানা অজুহাতে অধিকার করা হয়।

**সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭ :** ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে একশ বছরের মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছিল প্রত্যক্ষ-ভাবে ইংরাজ শাসনাধীন এবং বাকি অঞ্চল ছিল অনুগত দেশীয় নৃপতিদের অধীনে। শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে মাঝে মাঝে কোম্পানীর বিরুদ্ধে স্থানীয় এবং বিচ্ছিন্নভাবে অভ্যুত্থান হলেও ব্যাপক আকারে বিদ্রোহ প্রথম হয় ১৮৫৭ সালে। ইংরাজদের দেশীয় সৈন্যরা এই বিদ্রোহ শুরু করেছিল বলে সাধারণতঃ একে সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে প্রথম বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ১০ই মে মীরাটেও সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। দিল্লী, কানপুর, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসী, এলাহাবাদ, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানেও দ্রুত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহীদের বাইরেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ায় ক্রমশ এই বিদ্রোহ সাধারণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া

তোপী, নানাসাহেব, বিহারের কুনওয়ার সিং, অযোধ্যার বেগম, প্রভৃতি ছিলেন এই বিদ্রোহের কয়েকজন নেতা। সারা উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। দিল্লী দখল করে বিদ্রোহীরা মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ইংরাজরা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লী পুনরায় দখল করে। বাহাদুর শাহ বন্দী ও রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। ঝাঁসীর রাণী যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁতীয়া তোপীও ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নানাসাহেব নেপালে পালিয়ে যান। এক বছরের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করা হয়।



রাণী লক্ষ্মীবাঈ

**অভ্যুত্থানের কারণ :** বিভিন্ন কারণে এই বিদ্রোহ হয়েছিল। প্রথমতঃ, কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের দীর্ঘদিন ধরে শোষণের ফলে জনগণের আর্থিক দুর্গতি এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। একদিকে ইংরাজদের স্বার্থে ভারতে কুটির শিল্পগুলিকে ধ্বংস করা হয়, অপরদিকে কৃষকদের উপর অযৌক্তিক করের বোঝা চাপানোর ফলে জনগণের আর্থিক দুর্গতি ও ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক কারণে ইংরাজ বিরোধী মনোভাব উগ্র হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের জন্যও জনগণের মধ্যে ইংরাজবিরোধী মনোভাব ছিল। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার কল্যাণকর হলেও রক্ষণশীল হিন্দুরা এগুলিকে ধর্মনাশের প্রচেষ্টা বলেই মনে করত। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যাজকদের প্রচেষ্টা এই সন্দেহকে আরও দৃঢ় করে। এমনকি রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রবর্তনও তারা সন্দেহের চোখে দেখত। ধর্মনাশের আশঙ্কা হিন্দু-মুসলমানদের মনে শঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয়তঃ ছলে, বলে বা কৌশলে দেশীয় রাজ্যগুলিকে

দখল করার ফলে ঐ সকল রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী ও প্রজাদের মনে তীব্র ইংরাজ বিরোধী ঘৃণা দেখা দিয়েছিল। ডালহৌসীর সময় এই আগ্রাসী নীতি চরমে ওঠে। চতুর্থতঃ, ভারতীয়দের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার মনোভাবের জন্য ইংরাজদের প্রতি ভারতীয়দের মনে দীর্ঘ দিন ধরে অসন্তোষ সঞ্চিত ছিল। পঞ্চমতঃ সিপাহীদের অসন্তোষ এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ। দেশীয় সিপাহী ও ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে বেতন, ভাতা, পদোন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিরাট বৈষম্য ছিল। দেশীয় সিপাহীদের প্রতি ইংরাজদের ব্যবহারও ছিল উদ্ধত ও অপমানজনক। দেশীয় সৈন্যদের এই অসন্তোষ উপশমের কোন চেষ্টা করা হয়নি। এই সময় নূতন প্রবর্তিত এনফিল্ড রাইফেলের টোটার আবরণ দাঁতে কেটে নিতে হত। গুজব রটে যে ঐ আবরণে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনাশ করার জন্য। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অসন্তোষের বারুদে এর ফলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিপাহীরাই বিদ্রোহের সূচনা করে।

**১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ঃ** ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই অভ্যুত্থানের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেক লেখক এই অভ্যুত্থানকে মূলতঃ সিপাহী বিদ্রোহ বলেই আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে এবং সর্বত্র এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েনি। আবার অনেকে মনে করেন যে, এটা ছিল সামরিক ও সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহরূপে আরম্ভ হলেও ক্ষমতাচ্যুত সামন্তশ্রেণীর একটি অংশ আপন স্বার্থে এই বিদ্রোহে যোগ দেয়।

অন্যদিকে অনেক ঐতিহাসিক, সমকালীন বাঙালি মনীষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রভৃতি এই অভ্যুত্থানকে জাতীয় অভ্যুত্থান ও স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে মনে করেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন ও উমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কোন কোন স্থানে জনসমর্থন লাভ করলেও এই অভ্যুত্থানকে

জাতীয় অভ্যুত্থান বলা যায় না। এই সকল বিভিন্নমতের সামঞ্জস্য করে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

এই অভ্যুত্থানকে সচেতন জাতীয় অভ্যুত্থান হয়ত বলা যায়না, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ তখন ছিল না। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, সিপাহীদের মধ্যে সেই বিক্ষোভই আরও কয়েকটি কারণে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। সাধারণ জনসমষ্টি থেকেই সিপাহীরা এসেছিল, জনসাধারণের বিক্ষোভের ছায়াপাত সিপাহীদের মধ্যেও হয়েছিল। কোন কোন অঞ্চলে এই বিদ্রোহ গণ-বিদ্রোহে পরিণত হয়। যেখানে বা যাদের মধ্যে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করেনি, সেখানেও ইংরাজের পরাজয়ে লোকে উল্লসিত হত। ১৮৫৭ সালের ২১শে মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে শুধু সিপাহীরা নয়, সারা দেশই যেন বিদ্রোহ করছে। পরবর্তিকালের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেও ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল। ভারতীয় জনমানসে এই অভ্যুত্থান জাতীয় অভ্যুত্থান রূপেই স্বীকৃত। সামগ্রিক পর্যালোচনা করে একথা বলা অসঙ্গত হবেনা যে, জাতীয় অভ্যুত্থানের সকল বৈশিষ্ট্য ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে পাওয়া না গেলেও এটা ছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম অস্পষ্ট প্রকাশ।

**ব্যর্থতার কারণ:** সারা দেশে ইংরাজবিরোধী মনোভাবের পটভূমিকায় প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও এক বছরের মধ্যে এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। বিভিন্ন অঞ্চলে একসময়ে বিদ্রোহ হয়নি; বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল না। তাই বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থান আঞ্চলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অসংগঠিত বিচ্ছিন্ন আন্দোলন দমন করা সহজ হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যও

অভ্যুত্থানের সাফল্যের অন্তরায় ছিল। নানাসাহেব, ঝাঁসীর রাণী, বাহাদুর শাহের সমর্থকগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থের জন্য বিদ্রোহে যোগ দেয়। তাই কোন যোগ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও গড়ে ওঠেনি। এর ফলেও বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। তৃতীয়তঃ, অনেক অঞ্চলে বিদ্রোহীদের নৃশংস অত্যাচারের তারা জনসমর্থন হারিয়েছিল।

বিদ্রোহীদের এ সকল ত্রুটির পাশাপাশি ইংরাজদের কয়েকটি সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, অনেক দেশীয় রাজা ও জমিদার সক্রিয় ভাবে ইংরাজদের সাহায্য করেছিল। কাশ্মীর, রাজস্থান, পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের শাসকেরা বর্ধমানের মহারাজার ন্যায় অনেক জমিদার শিখ, গুর্খা, রাজপুত প্রভৃতি যুদ্ধনিপুণ জাতিগুলি ইংরাজদের সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজদের সামরিক সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহীদের থেকে অনেক উন্নত ছিল। তৃতীয়তঃ, রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যে ইংরাজদের যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছিল। চতুর্থতঃ, ভারতের বাইরে থেকেও সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ইংরাজরা আনতে পেরেছিল। কিন্তু সিপাহীরা ভারতের বাইরে থেকে কোন সাহায্য পায়নি।

একদিকে বিদ্রোহীদের অসুবিধা, অন্যদিকে ইংরাজদের সুবিধার ফলে এই মহাবিদ্রোহ সাফল্য লাভ করেনি।

বিদ্রোহের অবসানে ভারতের শাসনব্যবস্থা কোম্পানীর হাত থেকে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে চলে যায়। শাসন সংস্কার করে নূতন নীতিও ঘোষিত হয়।

**ইংরাজ শাসনের ফলঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষঃ** একশ বছরের ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই এর প্রভাব অনুভূত হচ্ছিল। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতকে তার শোষণের ক্ষেত্র, উপনিবেশে পরিণত করেছিল। ইংলণ্ডের স্বার্থে ভারতের আর্থিক জীবনকে বিপর্যস্ত করা হয়। যন্ত্রশিল্পের সস্তায় উৎপাদিত পণ্যে আমদানি করে ভারতের

কুটির শিল্প ধ্বংস করা হয়। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বস্ত্রবয়ন শিল্প। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য রোধের জন্য ইউরোপে রপ্তানি করা ভারতীয় পণ্যের উপর ধার্য করা হত উচ্চ হারে শুল্ক। ফলে বৈদেশিক বাজার ভারতের হাতছাড়া হয়ে যায়। শিল্পী ও কলাকুশলীরা বেকার হয়ে আর্থিক দুর্গতিতে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি বিখ্যাত বাণিজ্য নগরগুলির অবক্ষয় শুরু হয়। শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষির ক্ষেত্রেও অত্যাচার ছিল সীমাহীন। যত বেশী সম্ভব জমির খাজনা আদায়ের চেষ্টায় কৃষকদের দুর্গতির সীমা ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রাচীন জমিদার গোষ্ঠী লোপ পাওয়ায়ও অনেকের দুর্গতি বাড়ে। নূতন জমিদার শ্রেণী ছিল সরকারের অনুগত। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল চাষে বাধ্য করায়ও অনেক স্থানের আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। অবশ্য মহাবিদ্রোহের পরে ইংরাজরা ভারতের কিছু কিছু বৃহৎ শিল্প এবং বাগিচাশিল্প ( চা ) স্থাপন করেছিল।

আর্থিক শোষণের ফলে অধিকাংশ লোকই ছিল দারিদ্রসীমার নীচে। দারিদ্র ও অত্যাচারের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল অসন্তোষ। ইংরাজ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রসার হয়েছিল, উদ্ভব হয়েছিল এক নূতন ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীই ইংরাজ শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। ইংরাজদের সৃষ্ট এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিবাদেই ক্রমে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) কোন্ ঘটনার পর বাংলার শাসনকর্তৃত্ব নবাবের হাত থেকে ইংরেজের হাতে যায়? ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(খ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ব্যাখ্যা কর। এই নীতির প্রয়োগের ফল কি হয়েছিল?

(গ) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ কার কার সাথে হয়েছিল ?

(ঘ) সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফলসহ বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) পলাশীর যুদ্ধ কবে হয়েছিল ? ইংরেজ নেতৃত্বে কে ছিলেন ? কার বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব পরাজিত হন ?

(খ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন ? কত খ্রীষ্টাব্দে কোন আইনের দ্বারা বাংলার গভর্ণরকে গভর্ণর-জেনারেল করা হয়।

(গ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি কবে কাদের মধ্যে হয়েছিল ? সন্ধির শর্ত কি ছিল ?

(ঘ) স্বত্ববিলোপ নীতির অর্থ কি ? এই নীতি কে প্রচলন করেছিলেন ?

(ঙ) দ্বৈত শাসন কাকে বলে ? এর তাৎপর্য কি ?

(চ) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সূত্রপাত কোথায় কার নেতৃত্বে প্রথম হয় ? তারপর বিদ্রোহ ভারতের কোন্ কোন্ জায়গায় ছড়ায় ?

(ছ) সিপাহী বিদ্রোহের নায়কদের কার কি পরিণতি ঘটেছিল ?

**৩। টীকা লিখ :**

(ক) সতীদাহ (খ) ঝাঁসির রানী লক্ষীবাঈ (গ) আফগান যুদ্ধ (ঘ) লর্ড ক্লাইভ।

**৪। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) ১৭৮৪ খ্রীঃ ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির দ্বারা ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়।

(খ) সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৭৬৫ খ্রীঃ এক সন্ধির দ্বারা ইংরাজদের বাংলার দেওয়ানী কর্তৃত্ব দান করেন।

(গ) পলাশী যুদ্ধের পর থেকে একশ বছরের মধ্যে প্রায় সমস্ত ভারতে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল।

(ঘ) ১৮৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবাবী শেষ হয়।

**৫। সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ভারতের শাসন ব্যবস্থা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর/রানী ভিক্টোরিয়ার/হাতে চলে যায়।

(খ) বিদ্রোহ শেষে বাহাদুর শাহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন/রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন।

(গ) স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তন করেন লর্ড ওয়েলেসলী/লর্ড ডালহৌসী।

(ঘ) আলিনগরের সন্ধি হয় ইংরেজের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার/মীরকাসিমের।

৬। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ**

(ক) বাংলার নবাব——বিরুদ্ধে——, ——, ——, ——প্রভৃতি ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজরাও অংশগ্রহন করে।

(খ) তখন কোম্পানীর ——, —— এবং —— প্রেসিডেন্সীতে তিনজন গভর্ণর ছিলেন।

(গ) ওয়েলেসলীর পরে ——বর্ণওয়ালিস দ্বিতীয়বার ——নিযুক্ত হন এবং তারপরে ১৮০৭ খ্রীঃ লর্ড ——গভর্ণর জেনারেল হন।

(ঘ) ১৮৫৭ সালের ২১ মে হিন্দু ——পত্রিকায় ——লিখেছেন যে শুধু ——নয়, সারাদেশই যেন বিদ্রোহ রয়েছে।

---

## অষ্টম অধ্যায়

# অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ

**যুক্তিবাদের যুগ ঃ** সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রভূত উন্নতি হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের স্থলে যুক্তিবাদ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীকে অনেকে যুক্তিবাদের যুগ বা প্রজ্ঞার যুগ বলে অভিহিত করে থাকে। যুক্তিবাদের প্রসারের ফলে দর্শন, সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে নূতন চিন্তার জাগরণ ঘটে। এই যুক্তিবাদের প্রসার আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

## আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

**কারণ ঃ** ১৭৭৬ সালে উত্তর আমেরিকায় ইংলণ্ডের তেরোটি উপনিবেশে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সাত বছর যুদ্ধের পর ১৭৮৩ সালে তাদের স্বাধীনতা লাভ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে বহু কারণ ছিল।

**স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ ঃ** ইংলণ্ড থেকে উপনিবেশগুলির দূরত্ব এবং যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে উপনিবেশগুলির শাসনকাজে ইংলণ্ডের সরকার সহজে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। কিন্তু বাণিজ্যিক বিষয়ে ইংলণ্ডের স্বার্থে উপনিবেশগুলির উপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। উপনিবেশগুলির উপর কর ধার্যের অধিকারও ইংলণ্ড দাবি করত। আমদানি-রপ্তানি ইংলণ্ডের জাহাজেই করতে হবে এরকম আইনও করা হয়েছিল। এসব আইনের অনেকগুলিই ছিল উপনিবেশের আর্থিক স্বার্থের পরিপন্থী। তাই উপনিবেশিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অসন্তোষ সত্ত্বেও ঔপনিবেশিকেরা প্রথমে কোন সক্রিয় প্রতিবাদ জানায়নি কারণ তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। ইংলণ্ডও কঠোরভাবে এই সকল বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেনি। উপরন্তু, তাদের আশংকা ছিল কানাডা থেকে ফরাসীরা আক্রমণ করতে পারে। সম্ভাব্য আক্রমণের সময় ইংলণ্ড থেকে সাহায্যের আশায় বিধিনিষেধের বোঝা তারা মেনে নিয়েছিল।

১৭৬৩ সালে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে কানাডা ইংলণ্ডের অধিকারে আসায় ফরাসী আক্রমণের আশঙ্কা আর রইল না। ঠিক এইসময় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় উপনিবেশগুলির নিরাপত্তার জন্য যে অর্থ ইংলণ্ড ব্যয় করেছিল, তার কিছুটা আদায় করার জন্য ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট গ্রেণভিল মন্ত্রীসভার প্রস্তাব ক্রমে ১৭৬৪ সালে 'সুগার এ্যাক্ট' এবং ১৭৬৫ সালে 'ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট' নামে দুটি আইনের দ্বারা উপনিবেশে আমদানি করা চিনি এবং

দলিলের উপর কর ধার্য করে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট উপনিবেশগুলির কোন প্রতিনিধি নেই, সুতরাং উপনিবেশে কর ধার্যের অধিকারও বৃটিশ পার্লামেণ্টের নেই এই যুক্তিতে উপনিবেশগুলি ঐ দুটি আইনের বিরোধিতা করে।

১৭৬৫ সালের অক্টোবর মাসে নিউ ইয়র্ক শহরে নয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা একটি কংগ্রেসে (সম্মেলন) মিলিত হয়ে ষ্ট্যাম্প এ্যাক্টর তীব্র বিরোধিতা করে ঘোষণা করেন যে প্রতিনিধিসভা ছাড়া কর ধার্যের অধিকার কারো নেই। উপনিবেশগুলি বৃটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করায় জর্জ গ্রেণভিল মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। নূতন রকিংহাম মন্ত্রিসভা ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট প্রত্যাহার করলেও একটি আইনের দ্বারা ঘোষণা করে যে উপনিবেশগুলির উপর কর ধার্যের অধিকার বৃটিশ পার্লামেণ্টের আছে।

১৭৬৭ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী চার্লস টাউনসেণ্ড উপনিবেশগুলিতে চা, কাঁচ, সীসা, রং ও কাগজ আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করলে বৃটিশ পণ্যবর্জন আন্দোলন উপনিবেশগুলিতে তীব্রতর হয়। এই সময় ইংলণ্ডের নূতন প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ, টাউনসেণ্ডের প্রবর্তিত শুল্ক প্রত্যাহার করে শুধু নীতিগত অধিকার প্রমাণের জন্য চা-এর উপর তিন পেনি কর ধার্য করেন। এই শুল্কের প্রতিবাদে বোষ্টন বন্দরে এক রাতে একদল ঔপনিবেশিক রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে ১৭৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩৪২ পেটি চা সমুদ্রে ফেলে দেয়। 'বোষ্টন চা আসর' নামে পরিচিত এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ ইংরাজ সরকার উপনিবেশগুলিকে শাস্তিদানের জন্য পাঁচটি দমনমূলক আইন পাশ করে কঠোর ব্যবস্থা-গ্রহণ করেন।

১৭৭৫ সালের মে মাসে ফিলাডেলফিয়ায় তেরোটি উপনিবেশের দ্বিতীয় কংগ্রেস থেকে রাজা তৃতীয় জর্জকে তাদের দাবি মানার

জন্য এক চরম পত্র দেওয়া হয়। উপনিবেশের সেনাপতিরূপে জর্জ ওয়াশিংটনকে নিয়োগ করাও হয়। ঔপনিবেশিকদের দাবি নাকচ করে তৃতীয় জর্জ সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করলে ঔপ-নিবেশিকেরা ফিলাডেলফিয়ায় তৃতীয় কংগ্রেসে মিলিত হয়ে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করে। এর দ্বারা উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন ও মুক্তরূপে ঘোষণা করা হয়।


জর্জ ওয়াশিংটন

**উপনিবেশগুলির জয়লাভের কারণ :** এই ভাবে ১৭৭৬ সালে আমেরিকায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, ১৭৮৩ সালে উপনিবেশগুলির জয়লাভে তার অবসান ঘটে। এই সংগ্রামে উপনিবেশগুলির জয়লাভের কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, সংগ্রাম শুরুর সময় ইংলণ্ডের অপরিমিত ধনবল, জনবল ও সামরিক শক্তি থাকা সত্বেও ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ইংলণ্ড গ্রহণ করেনি। ইংলণ্ডের প্রাথমিক অবহেলার সুযোগে ঔপনিবেশিকেরা প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ, পরে যখন ইংলণ্ড ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠায় তাদেরও অধিকাংশ ছিল বেতনভুক্ জার্মান সৈন্য। এরা অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করেছিল, জাতীয় অনুপ্রেরণা তাদের ছিল না। অন্যদিকে ঔপনিবেশিকগণ আদর্শ ও অধিকার বজায় রাখার জন্য জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করেছিল। তৃতীয়তঃ, ইংলণ্ডকে এককভাবে এই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ইংলণ্ড ছিল মিত্রহীন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা ফ্রান্স, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশে সক্রিয় বা পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছিল। চতুর্থতঃ, ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার দূরত্বের জন্যও প্রয়োজনীয় সৈন্য ও

উপকরণ পাঠান সম্ভব হয়নি। পঞ্চমতঃ, উপনিবেশগুলির ভৌগলিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় ইংরাজ সেনাপতিরা উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এই অসুবিধে ঔপনিবেশিকদের ছিল না। ষষ্ঠতঃ, জর্জ ওয়াশিংটনের সুযোগ্য নেতৃত্ব ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের সহায়ক হয়েছিল। শুধু উপযুক্ত পরিকল্পনাই তিনি গ্রহণ করেননি, সৈন্যদের মধ্যে অনুপ্রেরণারও তিনি সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে ওয়াশিংটনের মত কোন প্রতিভাশালী সেনাপতি ছিল না। দুর্বল পরিকল্পনা ও পরিচালনাও ইংলণ্ডের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

এই সকল কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে উপনিবেশগুলি জয়লাভ করেছিল।

**আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল:** আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ১৭৮৩ সালে প্যারিসের চুক্তিতে তেরোটি উপনিবেশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ইংলণ্ড স্বীকৃতি দেয়। দ্বিতীয়তঃ, নবগঠিত এই রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় ভগবান-প্রদত্ত রাজ ক্ষমতার নীতি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। এর ফলে অন্যান্য দেশেও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের প্রেরণা পেয়েছিল। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাজয়ের ফলে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রক্ষণশীল টোরীদলের ব্যর্থতার ফলে উদারপন্থী হুইগ দল ক্ষমতা লাভ করে। চতুর্থতঃ, ফ্রান্সও এই সংগ্রামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অনেক ফরাসী আমেরিকার পক্ষে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, কয়েক বৎসর পরে তার ফলেই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে তারা অনুপ্রেরণা পায়। উপরন্তু, এই যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য ফ্রান্সের রাজার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

**ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব এবং ইহার অর্থঃ** যন্ত্র আবিষ্কারের আগে শ্রমই ছিল উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন। উৎপাদন ছিল কুটির শিল্পভিত্তিক। কুটির শিল্পের উৎপাদন ছিল অল্প, বিক্রির বাজারও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে অল্প সময়ে সমপরিশ্রমে অনেক বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন বেশী হওয়ায় কাঁচামালের চাহিদা বাড়ে, বিক্রীর বাজারও প্রসারিত হয়। বেশী উৎপাদনের জন্য বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। স্বভাবতই ঐ সকল শিল্পে বহু শ্রমিকেরও প্রয়োজন হয়। এইভাবে একদিকে নূতন শ্রমিক শ্রেণী, অন্যদিকে বড় বড় কলকারখানা স্থাপনের জন্য এক পুঁজিপতি মালিক শ্রেণীরও উদ্ভব হয়। ফলে সামাজিক কাঠামোয় দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন। এই আমূল পরিবর্তনকেই শিল্পবিপ্লব বলা হয়।

অনুকূল পরিবেশ থাকায় শিল্পবিপ্লব প্রথমে ইংলণ্ডে হয়েছিল। প্রথমতঃ, বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে তোলার মত মূলধন ইংলণ্ডে ছিল। বহির্বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে ইংলণ্ড প্রচুর মূলধন সঞ্চয় করেছিল। তাছাড়া ইংলণ্ডের ভূস্বামিদের হাতেও প্রচুর মূলধন সঞ্চিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের অভাবও ইংলণ্ডে ছিল না। জমিদাররা বেশী লাভের জন্য ছোট ছোট চাষীদের জমি থেকে উৎখাত করছিল। এই সকল উৎখাত-চাষীরা জীবিকার তাগিদে শিল্প-শ্রমিকে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, যন্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় লোহা এবং কয়লাও ইংলণ্ডে পর্যাপ্ত ছিল। চতুর্থতঃ, উপনিবেশ স্থাপন এবং বহির্বিশ্বে বাণিজ্যের প্রয়োজনে আগে থেকেই ইংলণ্ডে যে বড় বড় লৌহ শিল্প গড়ে উঠেছিল, সেই অভিজ্ঞতা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও বড় বড় কারখানা স্থাপনে অনুপ্রেরণা দেয়। পঞ্চমতঃ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থাকায় বড় বড় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা-মাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির বাজারের সুবিধাও ইংলণ্ডের ছিল। ষষ্ঠতঃ, শিল্পে নিয়োগ করার মত যন্ত্র প্রথমে

ইংলণ্ডেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই সকল কারণে শিল্পবিপ্লব ইংলণ্ডেই প্রথমে হয়েছিল।

**কৃষিবিপ্লব :** শিল্পবিপ্লবের পাশাপাশি কৃষির ক্ষেত্রেও এই সময় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল। কৃষি-পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং উন্নত কৃষি ব্যবস্থার ফলেই কৃষিবিপ্লব হয়েছিল। বড় বড় শিল্প গড়ে ওঠায় এবং শিল্প একটি অঞ্চলে গড়ে ওঠার প্রবণতার ফলে স্থানে স্থানে অনেকগুলি শিল্প কারখানা নিয়ে গড়ে উঠেছিল শিল্পনগরী। জীবিকার খোঁজে গ্রামাঞ্চল থেকে অনেকে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে শিল্পনগরীতে এসে ভিড় করে। এর ফলে একদিকে শহরাঞ্চলে কৃষিপণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে কৃষিমজুরের অভাবের ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। কেবলমাত্র খাদ্য শস্যই নয়, শিল্পের প্রয়োজনীয় কৃষিজ পণ্যের চাহিদাও বেড়ে যায়। প্রয়োজনের তাগিদে অল্প শ্রমে বেশী কৃষি উৎপাদনের চেষ্টার ফলে কৃষির ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল। সার, যন্ত্র ব্যবহার ও উন্নত চাষের ব্যবস্থার দ্বারা যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছিল, তেমনি ছোট ছোট চাষীদের উৎখাত করে বড় বড় আবাদ সৃষ্টির দ্বারাও কৃষিপণ্যের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা হয়েছিল। কৃষির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কৃষিবিপ্লব নামে পরিচিত। শিল্পবিপ্লবের ফলে যেমন কৃষিবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল, তেমনি কৃষিবিপ্লবও শিল্পবিপ্লবে সহায়তা করেছিল।

**শিল্পবিপ্লবের ফলাফল :** শিল্পবিপ্লবের ফলে দ্রুত অনেক বেশী উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় ভোগ্য পণ্যের দাম সস্তা হয়েছে। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অনেক বড় বড় শিল্প একস্থানে গড়ে ওঠায় উৎপত্তি হয়েছে নূতন নূতন শিল্পনগরীর। যান্ত্রিক কারখানায় সস্তায় উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। বড় বড় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীর জন্য ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

## ফরাসী বিপ্লব

**প্রাক্ বিপ্লব চিন্তাধারা ঃ** অষ্টাদশ শতকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে জ্ঞান ও যুক্তিবাদের যে প্রসার হয়েছিল, তার ফলে ফরাসী দেশেও রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই নূতন চিন্তার বিকাশ ঘটে। অনেক দার্শনিক পণ্ডিতেরা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে সেগুলি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনজন ফরাসী দার্শনিক—রুশো, ভলতেয়ার এবং মণ্টেস্কু। তাঁদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফরাসী দেশের মধ্যবিত্তগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব করে।



মণ্টেস্কু



ভলতেয়ার

দার্শনিক মণ্টেস্কু ( ১৬৮৯-১৭৫৫ ) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ করে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শাসন, বিচার ও আইন বিভাগকে পৃথকীকরণের নীতি প্রচার করেন। রাষ্ট্র-ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাঁর এই নূতন তত্ত্ব ইউরোপে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

প্রাক্-বিপ্লব যুগের আর একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন ভলতেয়ার ( ১৬৯৪-১৭৭৮ )। তাঁর নাটক, ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি সমকালীন ফরাসী সমাজকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের বিশেষ সুবিধাকে তিনি তীব্র

কষাঘাত করেছিলেন। তাঁর সরস ব্যঙ্গাত্মক লেখায় চার্চ কঠোর ভাবে সমালোচিত হয়েছিল।

চিন্তার জগতে সব চাইতে বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন রুশো (১৭১২-৭৮)। তাঁর 'সামাজিক চুক্তির' মতবাদের দ্বারা তিনি প্রচার করেছেন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে জনগণের হাতে এবং জনগণের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা রাজা রাষ্ট্র-ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার পেয়েছে। জনগণের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করলে রাজাকে পদচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে। রুশোর মতবাদ, সাম্যের নীতি এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের ক্ষমতার নীতি শুধু ফরাসী দেশেই নয়, সমস্ত ইউরোপে বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।



রুশো

কারণঃ অষ্টাদশ শতকে প্রাক্-বিপ্লব যুগের এই সকল চিন্তা-নায়কদের রচনা ফরাসী সমাজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের পথের ইঙ্গিত দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল।

ফরাসী সমাজ এই সময় তিনটি শ্রেণীতে বা এস্টেটে বিভক্ত ছিল। যাজকেরা প্রথম, অভিজাত শ্রেণী দ্বিতীয়, এবং বাকি সবাই তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল। প্রথম দুটি শ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ভোগ করত বলে ফরাসী সমাজকে সুবিধাভোগী ও সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণীরূপেও ভাগ করা যায়। তৃতীয় শ্রেণী, প্রধানতঃ দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় এবং বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বিদ্যায় বুদ্ধিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম দুটি শ্রেণী থেকে উন্নত ছিল। অনেকের আর্থিক সঙ্গতিও অভিজাত শ্রেণীর

থেকে বেশী ছিল। তথাপি তারা সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল।

দেশের প্রত্যয় ও পরোক্ষ করের বোঝাও প্রধানতঃ তৃতীয় শ্রেণীকেই বইতে হত। রাজস্বের শতকরা ৯৬ ভাগ তারাই দিত। তাছাড়াও সামন্তকর, ধর্মকর এবং আরও নানা প্রকার আর্থিক দাবি তাদের মেটাতে হত।

যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা ও অধিকার, অভিজাত শ্রেণীর অহমিকা ও শ্রেণীবৈষম্য তৃতীয় শ্রেণীকে বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সম্পদশালী ব্যবসায়ী শ্রেণীকে, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব করার প্রেরণাও তারা পেয়েছিল।

এই অবস্থায় ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই দীর্ঘদিনের অমিতব্যয়িতা ও বিলাসব্যসন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে নিঃশেষিত রাজকোষ পূর্ণ করার তাগিদে যখন করের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য এষ্টেট্‌স্ জেনারেল বা পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন তখন তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ প্রথমে নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা নিয়েই আলোচনা দাবি করে। এর ফলেই ফরাসী দেশে ১৭৮৯ সালে বিপ্লব শুরু হয়।



ষোড়শ লুই

**বিপ্লবের প্রসার :** রাজা এবং প্রথম দুটি শ্রেণীর বিরোধিতা সত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ১৭৮৯ সালের ২০শে জুন 'টেনিস কোর্টের' শপথ গ্রহণ করে নিজেদের জাতীয় সভারূপে ঘোষণা করে এবং একটি নূতন সংবিধান রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে। রাজা এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলে জাতীয় সভাই সংবিধান সভারূপে নূতন সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সংবিধান সভার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত রাজা জনপ্রিয় মন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত করে প্যারিস ও ভের্সাইতে সৈন্য সমাবেশ করলে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ১৪ই জুলাই জনগণ স্বৈরাচারের প্রতীক ব্যাষ্টিল কারাগার আক্রমণ করে দখল করে। রাজা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। জাতীয় সভার এক রাত্রির অধিবেশনে ত্রিশটি আইন পাশ করে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বাতিল করা হয়। অনেক অভিজাত ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

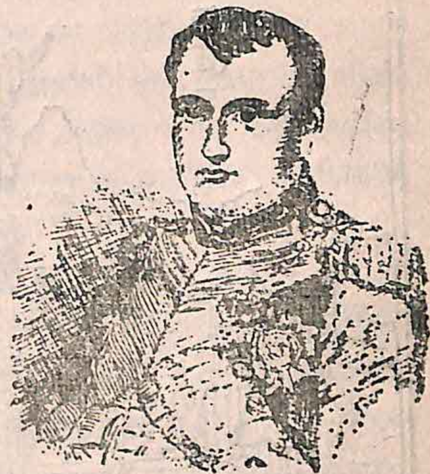
১৭৮৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৭৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সংবিধান সভা পুরানো ব্যবস্থা বাতিল করে একটি নূতন সংবিধান প্রণয়ন করে। ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সংক্রান্ত একটি ঘোষণার দ্বারা সকলের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হলেও বাস্তবে সকল নাগরিককে ভোটাধিকার নূতন সংবিধানে দেওয়া হয়নি। মণ্টেস্কুর ক্ষমতা বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করে শাসন, বিচার ও আইনবিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে চার্চকেও রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

নূতন সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আইন সভার প্রণীত দুটি আইনের রাজা বিরোধিতা করায় প্যারিসের জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে এবং শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হওয়ায় সংবিধানও বাতিল হয়ে যায়। নূতন শাসনবিধি প্রণয়ণের জন্য ১৭৯২ সালে গঠিত হয় জাতীয় কনভেনশন।

জাতীয় কনভেনশন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বিপ্লব বিরোধী সমস্ত শক্তিকে চূর্ণ করে। রাজা, রাণী ও আরও অনেককে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। বৈদেশিক ক্ষেত্রেও বিপ্লববিরোধী ইউরোপীয় শক্তিজোটের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়। কনভেনশন প্রণীত সংবিধান-অনুযায়ী গঠিত ডাইরেক্টরীর শাসনকালে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করেন নেপোলিয়ন।

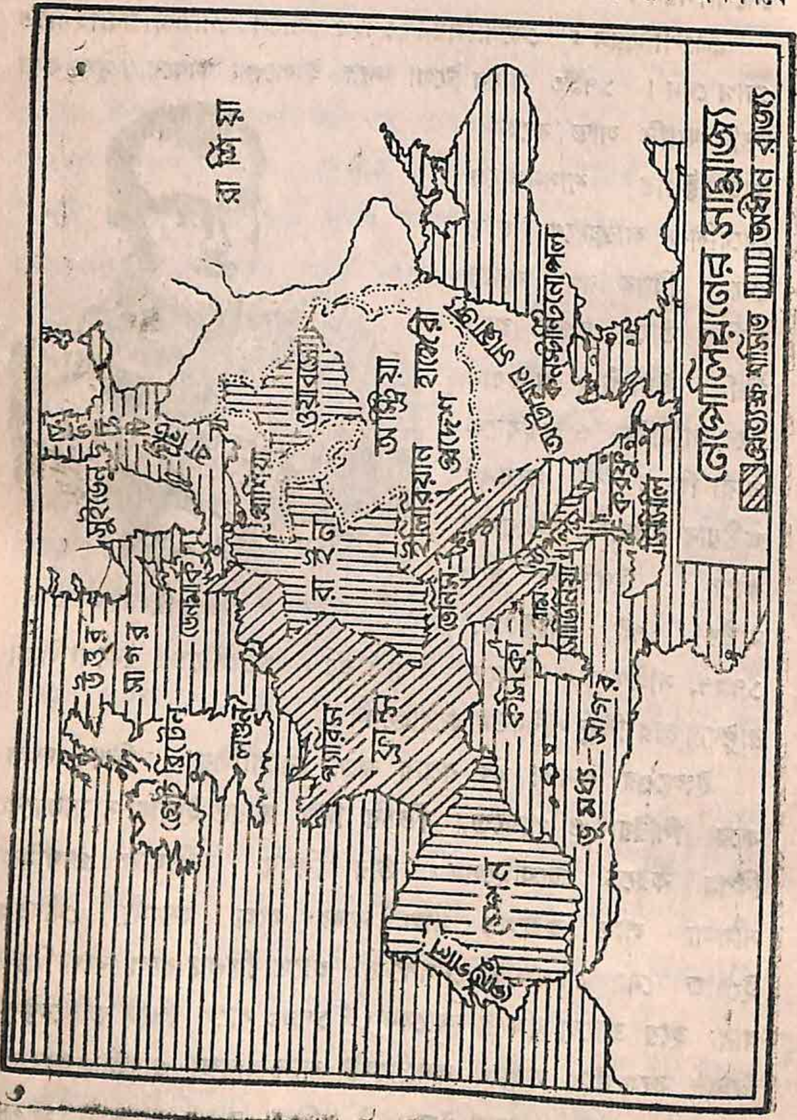
**নেপোলিয়ন :** নেপোলিয়ন ১৭৮৫ সালে গোলন্দাজবাহিনীতে যোগ দেন। ১৭৯৩ সালে টুলো বন্দর ইংলণ্ডের অবরোধ মুক্ত করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ডাইরেক্টরীর শাসনকালে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে বিপ্লব রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হলে তিনি ইটালী অভিযান করে সার্দিনিয়া ও অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার কাছে উপস্থিত হলে অষ্ট্রিয়া ১৭ই অক্টোবর, ১৭৯৭, সন্ধিস্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ইটালীতেও নেপোলিয়ন রাষ্ট্রব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করেছিলেন।



নেপোলিয়ন

ইংলণ্ডের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য নেপোলিয়ন মিশর দখল করে সিরিয়া ও পারস্যের ভিতর দিয়ে ভারত ইংরাজ সাম্রাজ্যকে বিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মিশর অভিযান প্রাথমিক সাফল্য লাভ করলেও নীল নদের যুদ্ধে ফরাসী নৌবহর ইংরাজ নৌ সেনাপতি নেলসনের হাতে বিধ্বস্ত হলে নেপোলিয়ন বাধ্য হয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৭৯৯ সালে তিনি ডাইরেক্টরী উচ্ছেদ করে তাঁর অধীনে কনস্যুলেট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রথম কন্সালরূপে সমস্ত ক্ষমতাই ছিল তার হাতে। ১৮০৪ সালে কনস্যুলেট শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করে নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্রেরও অবসান

হয়। ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যে প্রথম কন্সালরূপে নেপোলিয়ন বহু জনহিতকর সংস্কার করেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক, বিচার বিভাগীয়, অর্থনৈতিক, ধর্মসংক্রান্ত বহু সংস্কার করে নেপোলিয়ন জনগণকে




আইনের চোখে সমান অধিকার দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্বও করেছিলেন।

বিপ্লবের সৈনিকরূপে নেপোলিয়ান বৈদেশিক আক্রমণ থেকে যেরূপ বিপ্লবকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি নানাবিধ সংস্কার করে বিপ্লবের মূল দাবি সাম্যকেও আইনসঙ্গত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সম্রাটরূপেও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লব বিরোধী মনে হলেও বিজিত দেশসমূহে ফরাসী বিপ্লবজাত ভাব-ধারাকে প্রসারিত করে এবং সাম্যের ভিত্তিতে বৈপ্লবিক সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবকেই সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইটালি ও জার্মানির শোষিত জনগণ নেপোলিয়নের অধীনে জাতীয় ঐক্যের স্বাদ কিছুটা লাভ করেছিল। নেপোলিয়ন ছিলেন তাঁদের কাছে মুক্তির দূত।

সম্রাটরূপে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করলেও ইংলণ্ডকে নেপোলিয়ন পরাজিত করতে পারেননি। ইংলণ্ডের বাণিজ্য ধ্বংসের জন্য তাঁর প্রবর্তিত 'মহাদেশীয় অবরোধ' ব্যবস্থাকে সফল করার জন্য স্পেনও তিনি দখল করেছিলেন। কিন্তু জার্মানি ও ইটালিতে নেপোলিয়নের শাসন অভিনন্দিত হলেও স্পেনে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ শুরু হয়। স্পেনের জাতীয় প্রতিরোধ দমন করতে নেপোলিয়ন সক্ষম না হওয়ায়, ইউরোপের প্রায় সর্বত্র নেপোলিয়নের বিরোধিতা শুরু হয়। রাশিয়ার বিরোধিতা দমন করার জন্য নেপোলিয়ন এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অভিযান করলে সেই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াতেও শুরু হয় মুক্তি সংগ্রাম। নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত 'লাইপজিগের যুদ্ধে' পরাজিত হন এবং ১৮১৪ সালে প্যারিসের পতনের ফলে 'ফন্টেনব্ল্যুর সন্ধি'র দ্বারা নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হন। কিছুদিন পরে এলবা দ্বীপ থেকে পালিয়ে এসেও পুনরায় সিংহাসন দখল করলেও ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি ১৫ই জুলাই, ১৮১৫ সালে আত্মসমর্পণ করেন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় ১৮২১ সালে নেপোলিয়ন মারা যান।

**ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী অবদান :** নেপোলিয়নের পতনের পরে

ইউরোপের শক্তিবর্গ ভিয়েনা কংগ্রেসে ফ্রান্স ও ইউরোপে আবার প্রাক্ বিপ্লবীয় অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিপ্লবের কয়েকটি স্থায়ী অবদান মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। প্রথমতঃ, বিপ্লবের বাণী জনমানসে যে চেতনার সঞ্চার করেছিল, তার ফলে বিপ্লবোত্তর যুগে ফ্রান্সে পূর্বতন বুরবো রাজবংশ স্থাপিত হলেও তাঁরা আগের মত শক্তিশালী স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হতে পানেনি। ধর্মাচারণের স্বাধীনতা, সামাজিক অসাম্যের বিলোপ, জমিতে স্বত্ববান স্বাধীন কৃষককূলের উদ্ভব, এই সব ছিল ফ্রান্সে বিপ্লবের স্থায়ী অবদান। ইউরোপ এর বিরোধিতা করেছিল বলেই দশম চার্লসের বিরুদ্ধে ১৮৩০ সালে অভ্যুত্থান হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের বাইরেও সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে নিপীড়িত জনগণের মনে মুক্তির আশ্বাস দান করেছিল। তৃতীয়তঃ, ইউরোপের যে সব দেশে নেপোলিয়নের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল, সে সব দেশে সামন্ত যুগের অবসান হয়ে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছিল। চতুর্থতঃ, সাম্যের নীতিতে প্রণীত নেপোলিয়নের আইন-বিধি ইউরোপের অন্যান্য দেশকেও অনুপ্রাণিত করে এবং অন্যান্য দেশেও ক্রমে ক্রমে আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। পঞ্চমতঃ বিপ্লবী আদর্শ প্রসারের ফলে নূতন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল। ইটালি ও জার্মানিতে নেপোলিয়ন যে রাজনৈতিক ঐক্য সাময়িকভাবে দিয়েছিলেন, তার চেতনা ভিয়েনা কংগ্রেস জনমানস থেকে দূর করতে পারেনি। ভিয়েনা কংগ্রেসোত্তর যুগে ইতালি ও জার্মানির ইতিহাস হল বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদের সংগ্রামের ইতিহাস। এর ফলেই ইতালি ও জার্মানি ঐক্য লাভ করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, সমকালীন এবং অনাগত ভবিষ্যতের নির্যাতিত শোষিত জনমনে বিপুল আশার সঞ্চার এবং সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ

জীবনের ইঙ্গিত রাখাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী অবদান। এই বিপ্লব বহুযুগের জন্য প্রগতির উত্তরাধিকারিত্ব রেখে গিয়েছে।

## অনুশীলনী

**১। সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে কি কি করণ ছিল ?

(খ) আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল এবং উপনিবেশগুলির জয়লাভের কারণ কি ?

(গ) শিল্পবিপ্লব বলতে কি বুঝ ? ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হবার কি কি অনুকূল পরিবেশ ছিল ?

(ঘ) ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি ? যে তিনজন বিশিষ্ট চিন্তা নায়কের রচনা সমাজকে সচেতন করে তুলেছিল, তাঁদের মতামত সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঙ) নেপোলিয়নের আত্মপ্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্য লিপ্সা এবং সমর কুশলতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(চ) ফরাসী বিপ্লব স্বদেশে ও বিদেশে যে স্থায়ী অবদান রেখেছিল সেগুলো আলোচনা কর।

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) 'যুক্তিবাদের যুগ' বা 'প্রজ্ঞার যুগ' কাকে বলা হয় ? এই যুগের প্রসারতার ফল কী হয় ?

(খ) 'সুগার অ্যাক্ট' এবং 'ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট' বলতে কি বুঝায় ?

(গ) 'বোষ্টন চা আসর'-এর ঘটনাটি কি ছিল ?

(ঘ 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ'-এর স্রষ্টা কে ছিলেন ? এই মতের তাৎপর্য কি ?

(ঙ) অষ্টাদশ শতকে ফরাসী সমাজ কটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ? 'টেনিস কোর্টের শপথ' কিভাবে হয় ?

**৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) এই শুল্কের প্রতিবাদে — বন্দরে এক রাতে এক দল ঔপনিবেশিক — দের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে — সালের ডিসেম্বর মাসে — পেটি চা সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই ঘটনা ——— নামে পরিচিত।

(খ) জমিদারেরা বেশি — জন্য ছোট ছোট — জমি থেকে উৎখাত করছিল। এই সব — — জীবিকার তাগিদে — পরিণত হয়।

(গ) — শতকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল — সালের — বিপ্লব।

(ঘ) ফরাসী সমাজ এই সময় — — বা — বিভক্ত ছিল। — প্রথম ও — দ্বিতীয় — ভুক্ত ছিল।

৪। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও ঃ**

(ক) 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের প্রচারক ছিলেন রুশো/মণ্টেস্কু/ভল্‌তেয়ার।

(খ) রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শাসন, বিচার ও আইন বিভাগ আলাদা রাখার নীতির প্রচারক ছিলেন রুশো/ভল্‌তেয়ার /মণ্টেস্কু।

(গ) কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং উন্নত কৃষি ব্যবস্থার ফলেই শিল্প বিপ্লব/কৃষিবিপ্লব/ফরাসী বিপ্লব হয়।

(ঘ) 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয় বোষ্টন/ফিলাডেলফিয়া শহরে।

৫। **সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ**

(ক) বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যুক্তিবাদের বদলে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

(খ) ১৮৭৩ সালে আমেরিকায় যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, ঔপনিবেশিকদের জয়ে ১৭৭৬ সালে তা শেষ হয়।

(গ) শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন বেশী হওয়ায় ভোগ্য পণ্যের দাম সস্তা হয়।

(ঘ) প্রাক্ বিপ্লব যুগে একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন ভল্‌তেয়ার।

৬। **টীকা লেখ ঃ** (ক) বোষ্টন চা আসর (খ) টেনিস কোর্টের শপথ।

---

## নবম অধ্যায়

# ১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস

**(ক) প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়া ঃ** নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় ফ্রান্সের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিপ্লবের আদর্শ প্রসারিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নেপোলিয়ন যে

সব রাষ্ট্রিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করেছিলেন তার প্রভাবে ইউরোপের প্রায় সব দেশেই গণতন্ত্র ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়। ইউরোপের শাসকগণ স্বভাবতই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। গণতন্ত্র ও জাতীয় চেতনাকে তারা ইউরোপে প্রচলিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী বলে মনে করতেন। তাই নেপোলিয়নের পতনের পরে ইউরোপের শক্তিগুলি বিপ্লবজাত গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের উদার আদর্শকে নির্মূল করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। এর ফলে উনবিংশ শতকের প্রথমদিকেই গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উনবিংশ শতকের ইতিহাস এই সংঘাতের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

কিন্তু অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ভিয়েনা কংগ্রেস ও চতুঃশক্তির চুক্তি দ্বারা ইউরোপে প্রাক্-বিপ্লব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ও বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল। ভিয়েনা সম্মেলনে কেবলমাত্র বিজয়ীদের ক্ষতিপূরণ এবং শক্তিসাম্যের নীতিই গৃহীত হয়নি। বৈধ অধিকারের নীতিও গৃহীত হয়েছিল। বৈধ অধিকারের নীতির দ্বারা যে রাজবংশ বিপ্লবের আগে যে অঞ্চলে রাজত্ব করত, তাঁদের আবার পূর্ণ ক্ষমতাসহ নিজ নিজ রাজ্যে ক্ষমতায় স্থাপন করা হয়। ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল, পোপের রাজ্য, ইতালির অন্যান্য রাজ্যে বিপ্লবের সময় বিতাড়িত বংশগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়। ফ্রান্সের শক্তি সীমিত রাখার জন্য ফ্রান্সের সীমানায় কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রও স্থাপন করা হয়। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলিও পেয়েছিল ভৌমিক পুরস্কার। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদার শাসনতন্ত্রও বাতিল করা হয়।

এই ব্যবস্থা স্বভাবতই জাতীয় আশা-আকাঙ্খা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী ছিল। তাই এই ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য চতুঃশক্তি চুক্তির দ্বারা যৌথ রক্ষা ব্যবস্থার নীতি গ্রহণ করা হয়। ইউরোপের সর্বত্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং প্রচলিত ব্যবস্থা

পরিবর্তনের জন্য গণআন্দোলন বা অভ্যুত্থান কঠোরভাবে দমন করে ইউরোপের শান্তি অক্ষুন্ন রাখাই ছিল চতুঃশক্তি চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমে ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এবং পরে ফ্রান্স এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হলেও মেটারনিকই ছিলেন এর প্রাণ। তাই বিপ্লব বিরোধী, রক্ষণশীল এই ব্যবস্থা মেটারনিক-ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

ভিয়েনা ব্যবস্থার দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং অভিজাততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। মেটারনিক-ব্যবস্থার দ্বারা এই রক্ষণশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। বহুজাতি অধ্যুষিত অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যে বিপ্লবী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মেটারনিক এক প্রচণ্ড দমননীতি প্রবর্তন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করে, সন্ত্রাসের দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে আচ্ছন্ন রাখার নীতিতে আংশিক সাফল্যও তিনি লাভ করেছিলেন। ইটালি ও জার্মানিকেও দুর্বল ও বিভক্ত রাখার নীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন। জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। জার্মানির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে উদারপন্থী আন্দোলন শুরু হলে তা দমনের জন্য ১৮১৯ সালে 'কার্লসবাদ ডিক্রী' নামে কতকগুলি কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা চালু হয়। ইতালিতে তাঁরই আগ্রহে চতুঃশক্তি সঙ্ঘ ১৮২১ সালে নেপল্‌স্-এর গণ বিদ্রোহ দমন করে। স্পেনেও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন কঠোরভাবে দমন করে বল্‌গাহীন প্রতিক্রিয়ার শাসন কায়েম করা হয়।

১৮৩০ এবং ১৮৪৮ সালে যখন ইউরোপের দেশে দেশে বিপ্লব দেখা দেয় তখন কঠোরভাবে সেই বিপ্লব দমন করা হয়।

এইভাবে বৈধ অধিকারের নীতি প্রয়োগ করে এবং তা রক্ষার চেষ্টায় প্রতিক্রিয়ার শক্তি ইউরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে কঠোরভাবে দমন করতে চেষ্টা করে এবং ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত সাফল্যও লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেলজিয়াম ও গ্রীস স্বাধীনতা লাভ

করতে সক্ষম হয়। ১৮৪৮ সালের পরে জাতীয়তাবাদের দাবিকে আর দমন করা সম্ভব হয়নি। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সাল-এর মধ্যে ইটালি ও জার্মানি জাতীয় ঐক্য অর্জন করেছিল।

**ইউরোপে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ (ইটালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলন)ঃ** আগে আলোচনা করা হয়েছে যে উনবিংশ শতকের ইতিহাস প্রধানত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সংগ্রামের ইতিহাস। ইটালি ও জার্মানির ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর ১৮৭১ সালে উভয় দেশেই জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হয়েছিল।

**ইটালিতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামঃ** উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ইটালি ছিল অসংঘবদ্ধ, অসংহত ও বহুধা বিভক্ত। বহুধা বিভক্ত ইটালির উত্তর দিক ছিল অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন। তাছাড়া পোপের রাজ্য ইটালিকে বস্তুত দুটি ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। ইটালির ঐক্যের পথে প্রধান বাধা ছিল বৈদেশিক শাসনের নিগড়। তাই ইটালির ঐক্য আন্দোলন ছিল প্রধানত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

নেপোলিয়নের বিজয় অভিযান ও শাসনের ফলে ইটালি ঐক্য লাভ না করলেও ঐক্যের চেতনা ইটালিতে জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে ইটালীর জাতীয় প্রশ্নটি উপেক্ষিত হয়। নেপলস্, সিসিলি, পার্মা, মদেনা, তাসকানী, পোপের রাজ্য, পীদমন্ত-সার্দিনিয়া ভেনেসিয়া এই কয়টি রাজ্যে ইটালিকে বিভক্ত করা হয়। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কও ছিল না।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কাঠোর দমন নিপীড়নের নীতির জন্য ইটালীতে প্রকাশ্য আন্দোলনের পরিবর্তে একাধিক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। সব চাইতে শক্তিশালী ও জনসমর্থনপুষ্ট সমিতির নাম ছিল কারবোনারি। বৈদেশিক শাসন উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। এই সমিতির উদ্যোগে ১৮২০ সালে নেপল্স্ ও পীদমন্তে সংঘটিত বিদ্রোহ প্রাথমিক সাফল্য লাভ

করলেও, অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী উভয় ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করে বিদ্রোহ দমন করে।

১৮৩০ সালে পার্মা, মদেনা এবং পোপের রাজ্যে গণবিদ্রোহ হলে অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। ইটালিতে প্রথম কয়েক বছরের গণবিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ইটালির জাতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রধান শত্রু যে অস্ট্রিয়া, এই চেতনা ইটালিয়রা লাভ করেছিল।

১৮৩০ সালের পর ইটালির স্তিমিত জাতীয় আন্দোলনকে সজীব রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছিলেন কাউন্ত কাভুর। তাঁর সম্পাদিত 'ইল রিসরজিমেনতো' পত্রিকাটি ইটালির নবজাগরণ আন্দোলনের মুখপত্র ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ইটালির জন্য আন্দোলন সংগঠন।

এই পর্বে ইটালির ঐক্য আন্দোলনের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন জিওসেপ ম্যাৎসিনি। কারবোনারি সমিতির বিক্ষিপ্ত ও অসংহত আন্দোলনে হতাশ হয়ে ম্যাৎসিনি 'নবীন ইটালি' নামে একটি দল গঠন করে স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ইটালির জন্য আন্দোলনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেন। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রেরণায় ইটালিরও সর্বত্র স্বৈরতন্ত্র অস্ট্রিয়া বিরোধী অভ্যুত্থান শুরু হয়। পীদমন্তের রাজা চার্লস আলবার্ত প্রজাদের চাপে কিছু উদার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রোমেও গণ অভ্যুত্থানের ফলে ম্যাৎসিনির নেতৃত্বে স্থাপিত হয় প্রজাতন্ত্র। কিন্তু চার্লস আলবার্ত অস্ট্রিয়ার কাছে এবং



ম্যাৎসিনি

রোমের প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়। রোমে আবার পোপ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ম্যাৎসিনি এর পর থেকে ইংলণ্ডে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। ১৮৪৮ এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও ম্যাৎসিনির আদর্শবাদ সমগ্র ইটালিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

দেশপ্রেমের চেতনাকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করেছিলেন কাউন্ত কাভুর। কাভুর ম্যাৎসিনির মত প্রজাতন্ত্রের বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৮৫২ সালে পীদমন্তের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে পীদমন্তের রাজার অধীনে ইটালিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে একদিকে তিনি পীদমন্তের আভ্যন্তরীণ সংস্কার করে পীদমন্তকে ইটালির নেতৃত্বের যোগ্য করে তুলেছেন, অন্যদিকে ইটালির সমস্যাটিকে একটি ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বৈদেশিক সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং যুদ্ধাবসানে প্যারিসের সন্ধিসভায় (১৮৫৬) অংশগ্রহণ করে কাভুর ইটালির সমস্যার প্রতি ইউরোপের শক্তিবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ফ্রান্সের সাহায্যে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে জুরিখের সন্ধিতে পীদমন্ত লম্বাডি লাভ করে। পার্মা, মদেনা, তাসকানি, রোমানা প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণ অত্যাচারী শাসকদের শাসন মানতে অস্বীকার করলে ইংলণ্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী গৃহীত গণভোটে এই রাজ্যগুলিও পীদমন্ত সার্দিনিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে ১৮৫৯ সালে ভেনেসিয়া, সিসিলি-নেপল্‌স্ ও পোপের রাজ্য ছাড়া সমগ্র উত্তর ও মধ্য ইটালি ঐক্যবদ্ধ হয়।

সিসিলি-নেপল্‌স্‌কে পীদমন্তের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করার কৃতিত্ব গ্যারিবল্ডির। ম্যাৎসিনির মন্ত্রশিষ্য গ্যারিবল্ডি ছিলেন জাতীয়তাবাদ ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। রেড সার্ট নামে একটি বাহিনীকে গড়ে তুলে তিনি তাদের যুদ্ধশিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে সিসিলিতে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে গ্যারিবল্ডি এক হাজার রেড সার্ট বাহিনী নিয়ে সিসিলি-নেপল্‌স্ দখল করেন। প্রজাতন্ত্রী হওয়া

সত্ত্বেও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্যারিবল্ডি সিসিলি-নেপল্‌স্ পীদমন্তের রাজা এমানুয়েলের কাছে অর্পণ করেন। এমানুয়েল ইটালির রাজা আখ্যায় ভূষিত হন।

এই সময় ভেনেসিয়া ও রোম ছাড়া ইটালির সকল অংশই ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিয়ে এমানুয়েল যুদ্ধের শেষে ভেনেসিয়া অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে লাভ করেন। চার বছর পর ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময় ফ্রান্স রোম থেকে সৈন্য সরিয়ে নিলে এমানুয়েল রোম অধিকার করেন। এইভাবে প্রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধের সুযোগে ভেনেসিয়া ও রোম ইটালির অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে। ইটালির জাতীয়তাবাদী ঐক্য সংগ্রামের অবসান হয়।

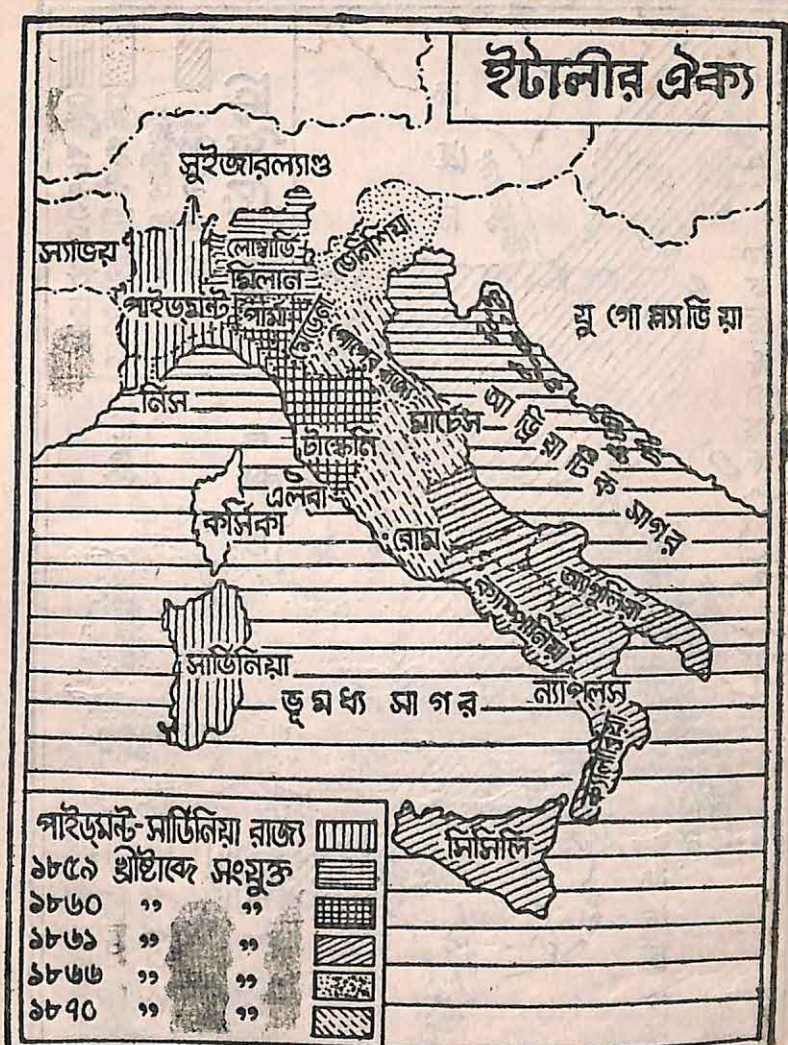


গ্যারিবল্‌ডি

**জার্মানির জাতীয় ঐক্য সংগ্রাম:** ইটালির মত জার্মানিও নেপোলিয়নের অধীনে কিছুটা ঐক্য ও উদার শাসনব্যবস্থা লাভ করেছিল। কিন্তু ভিয়েনা-সম্মেলন ইটালির মত জার্মানির জাতীয়তার প্রশ্নটিও উপেক্ষা করে। অনেক ছোট ছোট জার্মান রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটালেও জার্মানিকে আবার বহুধাবিভক্ত করে পুরানো শাসকদের হাতেই সমর্পণ করা হয়। তাছাড়া জার্মান রাজ্যগুলিকে নিয়ে অস্ট্রিয়ার অধীনে একটি রাষ্ট্র সমবায়ও গঠন করা হয়। প্রাশিয়ার সীমানাও সম্প্রসারিত করা হয়। জার্মানিতে কায়েম হয় অস্টিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্য।

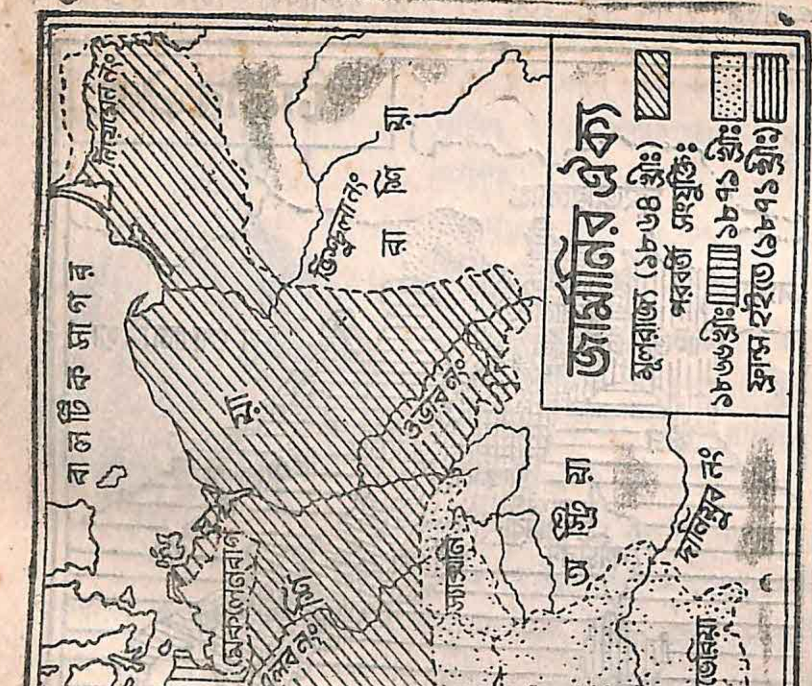
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে উদারনৈতিক আন্দোলনের পথে প্রধান

বাধা ছিল দুটি লক্ষ্য সম্পর্কে মতপার্থক্য এবং অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা। জার্মানিকে প্রাশিয়ার রাজবংশের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা হবে, অথবা প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হবে, তা নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। উপরন্তু




জার্মানির রাষ্ট্রসমবায়ের সভাপতি অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিক জাতীয়, গণতান্ত্রিক, বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থাও

গ্রহণ করেন। প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও ব্যাডেন, ব্যাভেরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে কিছুটা উদার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।




জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করেছিল অর্থনৈতিক সংহতি। ১৮১৮ সালে প্রাশিয়ায় সলভেরিন নামে যে শুল্ক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল, ক্রমে প্রায় সকল জার্মান রাজ্যই তাতে যোগ দিয়ে

অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করেছিল। সলভেরিন জার্মানির রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক সমস্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ করে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব জার্মানির ঐক্য ও জাতীয়তাবাদের কল্পনাও আশার দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল।

১৮৩০ সালে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানির কয়েকটি রাজ্যে সংস্কার ও সংবিধানের দাবি মুখরিত হলেও মেটারনিক কঠোর ভাবে তা দমন করেন। ১৮৪৮ সালে জার্মানিতে বিপ্লব দেখা দিলে জার্মানির ভবিষ্যৎ নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

জার্মানির ঐক্য সংগ্রাম সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়, প্রাশিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের নেতৃত্বে। ১৮৬১ সালে প্রথম উইলিয়াম রাজা হয়ে ১৮৬২ সালে অটোফন বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। রক্ষণশীল সমরবাদী নেতা বিসমার্ক আইন সভার মঞ্জুরী ছাড়াই অর্থ আদায় করে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলেন। জার্মানির ঐক্যের বাধা ছিল তিনটি বিদেশী রাষ্ট্র—ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স। উত্তর জার্মানির শ্লেস-



বিসমার্ক

ভিগ ও হলষ্টিন নামে ছোট রাজ্য দুটি ছিল ডেনমার্কের অধীনে। জার্মানির রাষ্ট্র সমবায়ে ছিল অস্ট্রিয়ার প্রভাব আর দক্ষিণ জার্মানিতে ছিল ফ্রান্সের প্রভাব। বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শ্লেসভিগ ও হলষ্টিন দখল করেন (১৮৬৪)। শ্লেসভিগ ও হলষ্টিনের ভবিষ্যৎ

কি হবে এই প্রশ্নে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিসমার্ক কূটনীতির দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে মিত্রহীন করে ১৮৬৬ সালে স্যাডোয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে। এই পরাজয়ের ফলে জার্মান রাষ্ট্রসমবায় থেকে অষ্ট্রিয়া বিতাড়িত হয় এবং রাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠন করে। দক্ষিণ জার্মানিতে ফ্রান্সের প্রভাব ছিল এবং ফ্রান্স ছিল জার্মানির ঐক্য বিরোধী। তাই দক্ষিণ জার্মানিকেও ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এক্ষেত্রেও বিসমার্ক প্রথমে কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে ইউরোপে মিত্রহীন করেন। তারপর স্পেনের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিলে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ও প্রাশিয়ার সম্রাটের মধ্যে আলোচনার বিবরণ কিছুটা বিকৃত করে বিসমার্ক এমনভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন যার অর্থ হল ফরাসী রাষ্ট্রদূত প্রাশিয়ার সম্রাটের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন। এর ফলে ফ্রান্সে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেদানের যুদ্ধে (১৮৭১) জার্মানির কাছে ফ্রান্স পরাজিত হলে দক্ষিণ জার্মানি ও উত্তর জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র গঠন করে। এই ভাবে ১৮৭১ সালে জার্মানি বিদেশী রাষ্ট্রের আধিপত্য মুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে।

ইটালি ও জার্মানিতে এই ভাবে জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হলেও ইটালি ও জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়নি। গণতান্ত্রিক অধিকারও স্বীকৃত হয়নি। ইটালিতে কিছুটা উদার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও, জার্মানিতে শাসক ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।

**আমেরিকার গৃহযুদ্ধ :** অষ্টম অধ্যায়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ক্রমশঃ আধিপত্য স্থাপন করতে থাকে। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা প্রসারিত হয়।

নূতন অঞ্চলের অপর্যাপ্ত শস্য, অজস্র খনিজ সম্পদ, বিশেষত সোনার খনি আবিষ্কার, ইত্যাদির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠল রেলপথ এবং বহু ভারী শিল্প। দেরীতে শুরু হলেও যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পায়ন দ্রুত ইউরোপের শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলিকেও ছাড়িয়ে গেল।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমান ভাবে হয় নি। উত্তারঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ ছিল অসম। শিল্পের প্রসার হয়েছিল প্রধানত উত্তরাঞ্চলে। দক্ষিণাঞ্চল ছিল কৃষি প্রধান। বাগিচায় তুলা উৎপাদন ছিল দক্ষিণের প্রধান আর্থিক ভিত্তি। শিল্প বিল্পবের ফলে ইংলণ্ডে তুলার চাহিদা বেশী হওয়ায়, বৃহদায়তন কৃষি খামারে নিগ্রো দাসশ্রম নিয়োগ করে অল্প ব্যয়ে বেশী উৎপাদন করা হত। এই ব্যবস্থায় মুনাফা হত বেশী, কিন্তু দাসশ্রম বাধা থাকত জমির সঙ্গে। কিন্তু উত্তরাঞ্চলে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল সস্তায় পর্যাপ্ত শ্রমিকের। শ্রমশক্তি দাসরূপে দক্ষিণাঞ্চলের জমির সঙ্গে আবদ্ধ থাকায় উত্তরাঞ্চল আপন স্বার্থের দাসমুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত ছিল। তাছাড়া উত্তরাঞ্চলের শিল্পের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল সংরক্ষণ নীতির। সংরক্ষণ নীতি থাকলে একদিকে যেমন বিদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হবে না, অন্যদিকে তেমনি সস্তায় দক্ষিণাঞ্চলের কাঁচামাল পাওয়া যাবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যেরও একচেটিয়া বাজার পাওয়া যাবে। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল ছিল সংরক্ষণ নীতির বিরোধী। অবাধ বাণিজ্য নীতিই তাদের কাম্য ছিল। কারণ তাহলে তাদের কাঁচামাল বেশী দামে বিদেশে বিক্রি করাও যেমন সম্ভব হবে, তেমনি বিদেশী শিল্পপণ্যের প্রতিযোগিতার ফলে সস্তায় শিল্পপণ্যও তারা পাবে।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চালের আর্থিক স্বার্থসংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'দাসপ্রথা'। এই প্রথার রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির 'দাসরাজ্য' ও 'মুক্তরাজ্য' এই দুভাগে সংবিধান অনুযায়ী বিভক্ত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব সেইভাবে

নির্ধারিত হত। তাই যুক্তরাষ্ট্রে নূতন কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির সময় উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত নূতন রাজ্যটি 'দাসরাজ্য' অথবা 'মুক্তরাজ্য' রূপে স্বীকৃত হবে কিনা এই প্রশ্নে।

উত্তরাঞ্চলে সস্তায় শ্রমিক পাওয়ার জন্য দাসমুক্তির আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র হতে থাকে। ১৮৩৩ সালে স্থাপিত হয় 'আমেরিকান এন্টিশ্লেভারি সোসাইটি'। সংবাদপত্রে, সাহিত্যে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালান হয়। ১৮৫২ সালে মিসেস ষ্টো-এর লেখা বিখ্যাত 'আঙ্কল টমস কেবিন' বইটি বেরোয়। নিগ্রোদাসদের উপর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী দাসমুক্তি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ১৮৫৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট দাসপ্রথার অনুকূলে রায় দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দুটি দলের মধ্যে ডেমোক্রেটিক দল ছিল দাসপ্রথার পক্ষে এবং এবং রিপাবলিকান দল ছিল দাসপ্রথার বিরোধী। ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান বা প্রজাতন্ত্রী দলের প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কন জয়লাভ করেন। এর ফলে দক্ষিণ বোরোলিনা, আলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুইসিয়ানা, টেক্সাস ও জার্জিয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জেফারসন ডেভিসকে রাষ্ট্রপতি করে একটি রাষ্ট্র সমবায় গঠন করে। নূতন রাষ্ট্রের সংবিধানে দাসপ্রথাকে স্বীকৃতি, অঙ্গরাজ্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। সংরক্ষণ নীতিরও বিরোধিতা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন দক্ষিণের এই রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার নেই ঘোষণা করেন। এর ফলে আমরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দাসপ্রথা নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরোধ থাকলেও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল দাসপ্রথার প্রশ্নে নয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার আছে কিনা সেই প্রশ্নে।

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনও ঘোষণা করেছিলেন যে দাসমুক্তি নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনের ভিত্তিতে।

যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতার প্রশ্নে এই গৃহযুদ্ধের কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর ক্যারোলিনা, টেনেসী, আরকানসাস্ ও ভার্জিনিয়া দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগ দেয়। দক্ষিণাঞ্চলকে প্রথমে পরাজিত করতে না পেরে লিঙ্কন ১৮৬২ সালে 'দাসমুক্তি'র ঘোষণা করেন এবং ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে তা কার্যকরী হয়। এর ফলে দক্ষিণের দাসদের সমর্থন লাভ করে উত্তরাঞ্চল দক্ষিণাঞ্চলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রইল, ক্রীতদাসগণও আইনের চোখে মুক্তি লাভ করল।

১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে উত্তর দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিরোধের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত। অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্যই দাসপ্রথা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। অবশ্য গৃহযুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে শুরু হয়েছিল অখণ্ডতার প্রশ্নে।

**আব্রাহাম লিঙ্কন:** আমেরিকার গৃহযুদ্ধে এবং দাসমুক্তির প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের। কেণ্টুকীর এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান আব্রাহাম লিঙ্কন। জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন ছোটখাট কাজ করেন। পরে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ইলিনয় রাজ্যপরিষদে ৮ বছর প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৮৫৮ সালে দাসপ্রথা বিরোধী রিপাবলিকান দলের হয়ে নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৮১৬ সালে লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসি-ডেণ্ট নির্বাচিত হন। তাঁর নির্বাচনে জয়লাভের ফলে দাসপ্রথার সমর্থক ডেমোক্রার্ট দলের নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন



আব্রাহাম লিঙ্কন

হয়ে গেলে, লিঙ্কন বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করেন। দাসমুক্তির সমর্থক হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে দাসদের মুক্তি দেবেন কি দেবেন না তা নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনের উপর। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি দক্ষিণের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার অস্বীকার করে বিদ্রোহী রাজ্যগুলিকে সামরিক শক্তির সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাথমিক এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ১৮৬২ সালে 'দাসমুক্তি' ঘোষণার দ্বারা তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই ঘোষণার ফলে বিদ্রোহী রাজ্যগুলির দাসগণের সমর্থন উত্তরাঞ্চল পাবে। তার ফলে দক্ষিণাঞ্চলের আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ভৌমিক অখণ্ডতা রক্ষা করে দাসত্বের মুক্তি দিলেও গৃহযুদ্ধের পরে গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ লিঙ্কন পাননি। গৃহযুদ্ধ অবসানের অল্প দিন পরেই লিঙ্কন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করে, ক্রীতদাসদের মুক্ত স্বাধীন নাগরিক হওয়ার অধিকার ও সুযোগ দিয়ে এবং গণতন্ত্রের আদর্শকে তুলে ধরে লিঙ্কন আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির পথ সুগম করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের সরকারই গণতন্ত্র' রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ স্থাপন করেছে।

**(খ) ইউরোপের শিল্পায়ন ও শ্রমিকশ্রেণী :** ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের কথা অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পবিপ্লব উনবিংশ শতকে ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নী যুদ্ধের অবসানে ফ্রান্স দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হয়। বেলজিয়াম, জার্মানিতেও স্থাপিত হয় বৃহৎ শিল্প। ফ্রান্স ও জার্মানিতে লোহা এবং কয়লা-শিল্পের প্রসার হওয়ায় খনিজ-সম্পদ সমৃদ্ধ সার অঞ্চল নিয়ে উভয়ের

মধ্যে তীব্র বিরোধও দেখা দেয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও কমবেশী যন্ত্রশিল্পের প্রচলন হয়েছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউ-রোপের প্রায় সকল প্রধান দেশে শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ হয়ে ইউরোপের এক নূতন যুগ—যন্ত্র সভ্যতার যুগ—সূচনা করে।

যান্ত্রিক শিল্পের উদ্ভব ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে সন্দেহ নেই। উৎপাদন সমস্যার সমাধান হলেও যন্ত্র সভ্যতা নূতন এক সমস্যা সৃষ্টি করেছে—সম্পদ বণ্টনের সমস্যা। শিল্পের প্রসারের ফলে সংগৃহীত সম্পদ কিন্তু সমাজে সমভাবে সকল শ্রেণীর হাতে যায়নি। তা সঞ্চিত হতে থাকল শিল্পের মালিক শ্রেণীর হাতে। উৎপাদনের প্রধান অংশীদার শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু এই বাড়তি সম্পদের অংশ পায়নি।

নূতন উৎপাদনী ব্যবস্থায় পুরোনো সামাজিক সম্পর্কের অবসান হয়ে নূতন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিল্প বিপ্লবের আগে শ্রমিকেরা নিজেরাই ছিল ছোট ছোট কুটির শিল্পের মালিক। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণী হল শ্রমের ক্রেতা, আর শ্রমিকশ্রেণী হল শ্রমের বিক্রেতা। শিল্প মালিকেরা অর্থের বিনিময়ে শ্রমিকের শ্রমকে উৎপাদনের কাজে লাগাত। সমাজে একটি স্থায়ী শ্রেণীরূপে শ্রমিক শ্রেণীর অবির্ভাব হয়। এদের শ্রম সম্পদ সংগ্রহ করত আর সেই সম্পদ সঞ্চিত হত মালিক শ্রেণীর হাতে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সামান্য মজুরীতে এই সকল শ্রমিককে ১৬ ঘণ্টা, এমনকি ১৮ ঘণ্টাও কাজ করতে হত। এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকারও শ্রমিকদের ছিল না। আইন করে শ্রমিকদের সঘংবদ্ধ হওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে মাঝে মাঝেই দেখা দিত শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ।

শ্রমিক-মালিক সংঘাতের সমস্যা সমাধান করে উৎপাদন বজায় রাখতে কিছু কিছু আইন পাশ করা হলেও সমস্যার সমাধান তাতে হয় নি। বিরোধের মীমাংসার জন্য শ্রমিক শ্রেণীও উদ্যোগ নিয়ে-ছিল। নিজেদের সংগঠিত করে ধর্মঘটের মাধ্যমে তারা দাবি

আদায়ের চেষ্টায় যথেষ্ট সাফল্য লাভও করেছিল। কিন্তু সংঘাতের স্থায়ী অবসান তাতে হয় নি।

উৎপাদনের আসল উপাদান হল শ্রম। কিন্তু শিল্প মালিকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণ করে। শ্রমিকের রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের দ্বারাই এই শোষণের অবসান সম্ভব। ক্রমশ এই চেতনা দেখা দেয়। এই চেতনা থেকেই জন্ম নেয় সমাজতন্ত্রবাদ।

শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার অবসানের জন্য যে সকল মনীষী সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে রবার্ট আওয়েন, সেণ্ট সাইমন, লুইব্লাঁ এবং শার্ল ফুরিয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা জার্মান মনীষী কার্ল মার্কসের পূর্বসূরী। কিন্তু শ্রমিকের দুঃখে কাতর হলেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর তাঁরা তাঁদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

মার্কস ও এঙ্গেলস্ঃ কার্লমার্কসই প্রথম ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সমাজতন্ত্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের তিনিই প্রকৃত জনক। মার্কসের তত্ত্বকে সাম্যবাদের তত্ত্বও বলা হয়। মার্কসের আগেকার সমাজতন্ত্রীদের তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি ছিল না বলে তাঁদের তত্ত্বকে ভাববিলাসী সামজতন্ত্রবাদ বলে মার্কস আখ্যা দিয়েছেন। ১৮১৮ সালে জার্মানিতে কার্লমার্কসের জন্ম হয়। ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করে তেইশ বছর বয়সে তিনি দর্শনে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। বিপ্লবী চিন্তার জন্য জার্মানি থেকে



কার্ল মার্কস

বিতাড়িত হয়ে ফ্রান্সে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এঙ্গেলস ছিলেন মার্কসের আমৃত্যু বন্ধু ও সহকর্মী। ফ্রান্স থেকে ব্রুসেলস এবং সেখান থেকে ১৮৪৯ সালে মার্কস ইংলণ্ডে আসেন। ইংলণ্ডেই তিনি বাকি জীবন কাটান।

ব্রুসেলসে থাকাকালীন এঙ্গেলস-এর সহযোগিতায় মার্কস তাঁর বিখ্যাত কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো বা ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এর মধ্যেই মার্কসের সাম্যবাদের মূলনীতি বিবৃত ছিল। এই ইস্তাহারের শেষ পাতায় শ্রমিকদের প্রতি মার্কসের আহ্বান ছিল 'ত্বনিয়ার শ্রমিক এক হও'। কারণ বন্ধন ছাড়া তাঁদের অন্য কিছু হারাবার ভয় নেই। মার্কসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল 'পুঁজি' (The Capital)। এই বইটিতে রয়েছে মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্ব। আরও অনেক রচনার মধ্যে মার্কসের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির আলোচনা রয়েছে। এই সকল রচনায় মার্কসের প্রধান সহযোগী ছিলেন এঙ্গেলস। তাই মার্কসের তত্ত্বকে মার্কস-এঙ্গেলস তত্ত্বও বলা হয়।

মার্কসের সাম্যবাদী তত্ত্ব বর্তমান জগতে শুধু একটি অর্থনৈতিক তত্ত্বই নয়, একটি জীবন দর্শনে পরিণত হয়েছে।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়া শক্তির বিরোধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(খ) ইটালিতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এবং ঐক্যসাধনের বিবরণ দাও ও ম্যাৎসিনির ভূমিকা আলোচনা কর।

(গ) জার্মানির ঐক্য সংগ্রামে বিসমার্কের নেতৃত্ব উল্লেখ কর।

(ঘ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে এবং দাসমুক্তির আন্দোলনে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা বর্ণনা কর।

(ঙ) 'মার্কসের সাম্যবাদী তত্ত্ব বর্তমান জগতে শুধু একটি অর্থনৈতিক তত্ত্বই নয়, একটি জীবন দর্শনে পরিণতি হয়েছে।' আলোচনা কর।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) কাউন্ট কাভুর কে ছিলেন ? তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম কি ? পত্রিকাটির কি ভূমিকা ছিল ?

(খ) ম্যাৎসিনি কে ছিলেন ? তাঁর নবগঠিত দলটি কি নামে পরিচিত ছিল এবং ঐক্য আন্দোলন কোন্ ভূমিকা নিয়েছিল ? ম্যাৎসিনির পরিণতি কি হয় ?

(গ) আব্রাহাম লিঙ্কন কত সালে কোন্ দলের প্রার্থী হয়ে কোথাকার প্রেসিডেন্ট হন ? কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয় ? গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি কি ছিল ?

(ঘ) কার সহায়তায় কিভাবে কালমার্কস্ তাঁর সাম্যবাদের মূল নীতি প্রকাশ করেন। তাঁর আহ্বানটি কি ছিল ? অর্থনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে লেখা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির নাম কি ?

৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) উদারপন্থী আন্দোলন সুরু হলে তা দমনের জন্য—সালে—নামে কতকগুলি কঠোর—ব্যবস্থা চালু হয়।

(খ) ১৮৬০ সালে সিসিলিতে গণ-বিদ্রোহ দেখা দিলে গ্যারিবল্ডি এক হাজার—বাহিনী নিয়ে—দখল করেন।

(গ) জার্মানির ঐক্যের বাধা ছিল তিনটি বিদেশী রাষ্ট্র —, — ও ফ্রান্স।

৪। **সঠিক উত্তরটির পাশে দাগ দাও :**

(ক) 'জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের সরকারই গণতন্ত্র—এ উক্তি করেছিলেন কার্লমার্কস/আব্রাহাম লিঙ্কন/বিসমার্ক।

(খ) ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করে তেইশ বছর বয়সে দর্শনে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন কার্লমার্কস/এঙ্গেলস্/কাভুর।

(গ) ১৮৫২ সালে মিসেস ষ্টো-এর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম দি ক্যাপিটাল/আঙ্কল টমস্ কেবিন/ইল রিসরজিমেনতো।

(ঘ) ইটালির ঐক্য আন্দোলনের নেতা ছিলেন বিসমার্ক/গ্যারিবল্ডি/ম্যাৎসিনি।

৫। **টীকা লিখ :**

(ক) আঙ্কল্-টমস্ কেবিন (খ) নবীন ইতালী (গ) দাসপ্রথা (ঘ) সলভেরিন।

## দশম অধ্যায়

## দূর প্রাচ্য

### ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনাপ্রবাহ ঃ

**চীন এবং পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ ঃ** স্মরণাতীত কাল থেকে বিদিশীরা ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্যোপলক্ষে চীনে এসেছে। চীনাদের সাথে ঐ সব আগন্তুকদের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। কন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় দেশসমূহের কার্যকলাপ চীনা কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাই তারা চীনে পাশ্চাত্য বণিকদের বাণিজ্যের ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। চীনা জনসাধারণকে বিদেশী সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য ইউরোপীয় বাণিজ্য ক্যাণ্টন বন্দরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়।

**অহিফেন যুদ্ধ এবং নানকিং সন্ধি ঃ** চীনারা প্রথমদিকে ইউরোপীয় বণিকদের কাছ থেকে বিশেষ কোন জিনিস কিনত না। তাই চীন থেকে বিদেশী বণিকরা রেশম, পোরসিলিনের বাসন, চা ইত্যাদি যে সব জিনিষ কিনত তার বদলে তারা মূল্যস্বরূপ সোনা বা রূপা দিত। দীর্ঘকাল ধরে সোনা বা রূপা দিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল। তাই চীনা দ্রব্যসমূহের বিকল্প হিসাবে কোন পণ্য তারা সেখানে বিক্রি করতে আগ্রহী হয়। এই বিকল্প হিসাবে প্রথমে পর্তুগীজরা এবং পরে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনে অহিফেন বা আফিং রপ্তানী করতে শুরু করে। প্রথমে আফিং রপ্তানির পরিমাণ ছিল অল্প। কিন্তু আফিং-এর ব্যবসা খুব লাভজনক হওয়ায় ইংরাজরা প্রচুর পরিমাণে আফিং চীনে রপ্তানি করতে থাকে। এতে একদিকে যেমন চীনাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটতে থাকে, অপরদিকে তেমনি চীন থেকে সোনা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু বাইরে চলে যেতে থাকে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ১৮০০

খ্রীঃ চীনে আফিং আমদানি নিষিদ্ধ করে সরকারী আদেশ ঘোষণা করা হল। কিন্তু ইংরাজদের কাছে এই ব্যবসা ছিল অত্যন্ত লাভজনক। তাই ইংরাজ বণিকরা চীনা রাজকর্মচারিদের ঘুষ দিয়ে বেআইনিভাবে সেখানে আফিং নিয়ে যেতে থাকে।

১৮৩৯ সালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরাজদের সাথে চীনের যুদ্ধ বাধে। মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরতি ঘটলেও ১৮৪২ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বা আফিং-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইংরাজরা তাদের নৌশক্তি এবং উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে চীনাদের পরাজিত করে। দক্ষিণ চীনের সাথে রাজধানী পিকিং-এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। এরপর চীন সরকার ইংরাজদের সাথে নানকিং এর শান্তি চুক্তি (১৮৪২) স্বাক্ষর করে। নানকিং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী চীন বিদেশীদের বসবাস ও বাণিজ্যের জন্য পাঁচটি বন্দর উন্মুক্ত করতে রাজি হল। এই পাঁচটি 'সন্ধি বন্দর'-এর নাম—ক্যান্টন, সাংহাই, আময়, নিংপো ও ফুচু।

**অতিরাষ্টিক অধিকার:** নানকিং সন্ধিতে ইংরাজরা প্রচুর সুবিধা পেলেও তারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাই ১৮৪৩ সালে তারা চীনকে বগ চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই চুক্তির এক উল্লেখযোগ্য ধারায় চীন ইংরাজদের 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' দিতে স্বীকৃত হয়। অতিরাষ্ট্রিক অধিকার পাওয়ার অর্থ হল যে দেশ এই অধিকার পাবে চীনে বসবাসকারী সেই দেশের নাগরিকদের বিচারের ভার ন্যস্ত থাকবে তাদের স্বজাতীয়দের ওপর। চীনে বাস করেও এই বিদেশীরা ছিল চীনা রাজশক্তির আয়ত্তের বাইরে। চীনের সার্বভৌমত্ব খর্বকারী এই অদ্ভুত সাম্রাজ্যবাদী বিধান দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল।

**সন্ধি বন্দর:** যে সব বন্দর বিদেশী বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয় সেখানে ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকান প্রভৃতি জাতির বণিকেরা বসবাস করতে শুরু করে। বিভিন্ন দেশের বণিকেরা বেশ কিছু জায়গা নিয়ে বাস করত। এগুলি 'কনসেসন' বলে অভিহিত হত।

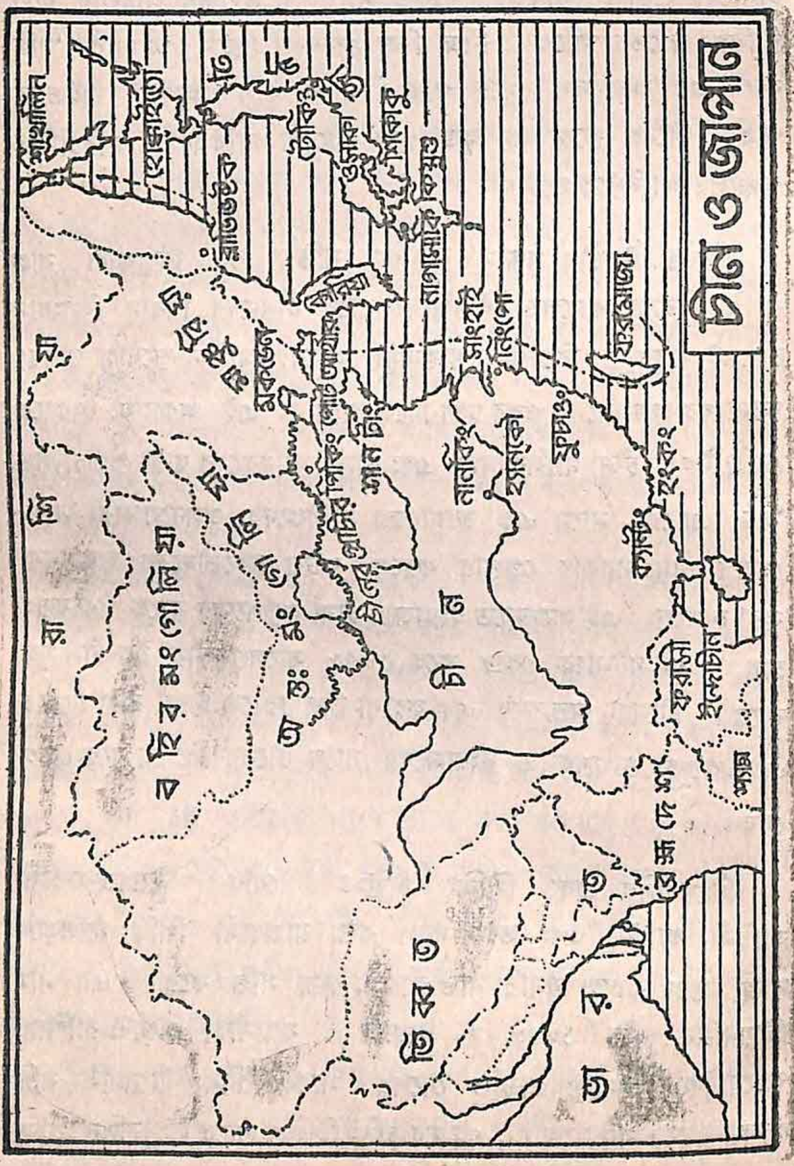
বিভিন্ন জাতির বণিকদের এই সন্ধি বন্দর সমূহে ছিল তাদের নিজস্ব কনসেসন। এই সব কনসেসনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ওপর চীনাদের কোন আধিপত্য থাকত না। অতিরাষ্ট্রিক অধিকার বলে বিভিন্ন জাতের লোকেরা নিজ নিজ দেশের আইন অনুযায়ী 'সন্ধি বন্দর'-এর কনসেসন সমূহে স্বাধীন ভাবে বাস করত। এইভাবে স্বাধীন চীনের বুকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদেশী আধিপত্যে পরিচালিত অঞ্চলের আবির্ভাব ঘটে।

**দ্বিতীয় ইঙ্গচীন যুদ্ধ**ঃ নানকিং সন্ধির পর কিছুকাল বাহ্য শান্তি বিরাজ করলেও বিদেশীদের সাথে চীনাদের বিবাদ বিসংবাদ চলতেই থাকে। বিদেশী শক্তিসমূহ আরো অধিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য চীনের ওপর চাপ দিতে থাকে। এই অবস্থায় হংকংয়ে রেজিষ্ট্রিকৃত চীনা মালিকানায় এবং চীনা নাবিকদের দ্বারা পরিচালিত 'লর্চা এ্যারো' নামে এক জাহাজের নাবিকদের জলদস্যুতার অভি-যোগে চীন সরকার গ্রেপ্তার করলে বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অবমাননা করা হয়েছে। এই অজুহাতে ইংরাজরা চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ৎ চায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮৫৬ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ বাধে। চীনের অভ্যন্তরে এক ফরাসী মিশনারীকে হত্যা করা হয়েছে এই অজুহাতে ফ্রান্স ও ইংরাজদের সাথে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।

**টিয়েনসিন** এবং **পিকিং চুক্তি**ঃ যৌথ ইংরাজ-ফরাসী বাহিনী ক্যান্টন এবং তাকু দখল করে রাজধানী পিকিং অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে চীনারা নতি স্বীকার করে সন্ধি করে। এর নাম টিয়েনসিন চুক্তি (১৮৫৮)। ইংরাজ ও ফরাসীরা ছাড়াও রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সাথেও চীন টিয়েনসিন-সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই সব চুক্তি মিলিত ভাবে টিয়েনসিন চুক্তি সমূহ নামে পরিচিত।

স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র সমূহের অনুমোদন রাজধানী পিকিংয়ে করার

ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চীনারা এ ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করলে ইংরাজ ও ফরাসীরা পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে, তাদের সম্মিলিত বাহিনী ১৮৬০




সালে পিকিং দখল করে সেখানকার বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাসটি সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেয়। পরাজিত চীন এবার পিকিং সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য

হয়। টিয়েনসিন চুক্তিসমূহ এবং পিকিং সন্ধি চীনের অভ্যন্তরে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে তারা চীনে বাণিজ্য করার সুবিধাও পায়। নানকিং, টিয়েনসিন এবং পিকিং চুক্তিসমূহ স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়ে চীন আর্থিক রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সার্বভৌমত্ব বহুলাংশে হারায়।

**চীনকে খণ্ডিত করার চেষ্টা ঃ** ১৮৯৪-৯৫ সালে ক্ষুদ্র এশীয় দেশ জাপানের সাথে যুদ্ধে পরাজয় তার এই দুর্বলতাকে আরও প্রকট করে তোলে। এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ। তারা চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে নানারকম সুবিধা নিজেদের জন্য আদায় করে নেয়। একটা বড় তরমুজকে সহজে কেটে যেমন বিভিন্ন লোক নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় সেই রকম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহও চীনের বিভিন্ন অংশকে নিজেদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত করতে চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক ভিনাক একে 'cutting the Chinese melon' বলে অভিহিত করেছেন।

**হের উন্মুক্ত দ্বার নীতি ঃ** চীনের কোন অঞ্চলে একটি শক্তি নিজ প্রাধান্য স্থাপন করলে তারা সেই এলাকায় অন্যান্য শক্তির ব্যবসা বাণিজ্যের পথে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকে। এতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অসুবিধা হয়। তাই চীনের সব এলাকায় যাতে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্যের মাধ্যমে অবাধ শোষণ চালিয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অফ স্টেট জন হে চীনে 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' গ্রহণের জন্য সব দেশের কাছে আহ্বান জানান। এই নীতি অনুযায়ী চীনের কোন এলাকায় বিশেষ এক শক্তির প্রভাব থাকলেও অন্যান্য রাষ্ট্রও সেই অঞ্চলে বাণিজ্যের সব রকম সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে বলা হয়। বৃটেন এই প্রস্তাবে উৎসাহের সাথে সমর্থন জানায়। অধিকাংশ দেশ উন্মুক্ত

দ্বার নীতি মোটামুটি মেনে নিলেও রাশিয়া এটা ঠিকভাবে গ্রহণ করেনি। এই নীতি চীনে শোষণের এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত করে।

## চীনের প্রতিক্রিয়া

**তাইপিং বিদ্রোহ ঃ** সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে চীনের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া তাইপিং বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। চীনারা সেখানকার মাঞ্চু রাজবংশকে এক বিদেশী রাজবংশ বলে মনে করত। তাই দীর্ঘদিন ধরে তাদের বিরুদ্ধে চীনাদের মনে অভিযোগ ধূমায়িত হচ্ছিল। পরবর্তী মাঞ্চু শাসকদের অযোগ্যতা, দরিদ্র ব্যক্তিদের শোষণ। প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনের লজ্জাজনক পরাজয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিও এই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

তাইপিং আন্দোলনের নেতা ছিলেন হুং-সিউ-চুয়ান্ নামক এক ব্যক্তি। এক সময়ে কঠিন রোগাক্রান্ত হুং-এর নাকি দিব্য দর্শন ঘটে। সে স্বপ্নে দেখে যে, এক সৌম্য দর্শন বৃদ্ধ তাঁকে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে অভিনন্দিত করে তাকে সমস্ত কুপ্রথা এবং অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলছে। চীনা ভাষায় অনূদিত বাইবেলের এক অংশ পড়ে তার মনে হয় যে ঐ বৃদ্ধ স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট। সে তখন বাইবেলের কিয়দংশ অবলম্বন করে একটি ধর্মমত গঠন করে নূতন ধর্মে দেশবাসীকে দীক্ষিত করতে লাগল। হুং এই ধর্মের নাম দেয় 'তাইপিং' যার অর্থ 'পরম শান্তি'।

প্রথম দিকে এই আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু হুং-এর শিষ্যদের প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতায় শঙ্কিত হয়ে মাঞ্চু শাসকেরা তাদের দমন করতে চেষ্টা করলে এই

আন্দোলন বিদ্রোহের রূপ নেয়, (১৮৫০)। প্রথম দিকে বিদ্রোহীরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। চীনের এক বিরাট অংশ বিদ্রোহীরা দখল করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদেশী শক্তিবর্গের সহায়তায় মাঞ্চু শাসকেরা এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থন হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। এর নেতা হুং আত্মহত্যা করে।

তাইপিং বিদ্রোহ ছিল এক ব্যাপক অভ্যুত্থান। এই বিদ্রোহে প্রায় তিন কোটি লোকের প্রাণহানি ঘটে। তাইপিং বিদ্রোহ মাঞ্চু বংশের শাসনের ভিত্তিকে টলিয়ে দেয়।

**শতদিনের সংস্কার:** পাশ্চাত্য দেশসমূহের এমনকি প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাপানের কাছেও লজ্জাজনক পরাজয় (১৮৯৪-৯৫) চীনের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চোখ খুলে দেয়। তারা যুগোপযোগী সংস্কারের জন্য এক আন্দোলন শুরু করে। এই সংস্কার আন্দোলনের নেতা ছিলেন ক্যাং-ইউ-ওয়েই।

১৮৯৮ খ্রীঃ তরুণ সম্রাট কুয়াং সু ক্যাং-এর পরামর্শমত শিক্ষা, শাসন, সাময়িক বিভাগ প্রভৃতির সংস্কারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি ঘোষণা বাণী প্রচার করেন। এতে সংস্কার বিরোধী প্রাচীন পন্থীরা শঙ্কিত হন। তাঁরা এই সংস্কার আন্দোলন দমন করার জন্য বিধবা সাম্রাজ্ঞী জুসির শরণাপন্ন হন। তরুণ সম্রাটের প্রগতিশীল কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে 'বৃদ্ধা বুদ্ধ' নামে পরিচিতা জুসি তাঁর অনুগত পরাক্রান্ত প্রদেশপাল ইউ-য়ান, সি-কাই এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতদের সহায়তায় কুয়াং সুকে বন্দী করেন। এরপর বন্দী সম্রাটের নামে জুসিই শাসন পরিচালনা করতে থাকেন। কুয়াং সু যে সব সংস্কার প্রবর্তিত করেছিলেন সেগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। এই সংস্কারগুলো মাত্র একশত দিন স্থায়ী হয়েছিল বলে এর নাম দেওয়া হয় 'শত দিনের সংস্কার।'

**বক্সার আন্দোলনঃ** সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর চীনকে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য এক বিদেশী বিরোধী আন্দোলন এবং হাঙ্গামা শুরু হয়। এই হাঙ্গামার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল 'ই হো তুয়ান' বা 'ন্যায়ের সুসন্তান মুষ্টি' নামক এক গুপ্ত সমিতি। 'সুসমঞ্জস মুষ্টি' থেকে এই আন্দোলন 'বক্সার' নামে পরিচিত হয়। 'দেশ রক্ষা কর' ও বিদেশীদের বিতাড়িত কর, এই ছিল বক্সারের জিগির। এই গুপ্ত সমিতির সদস্যদের নানা কুসংস্কার ছিল। বক্সাররা বিশ্বাস করত যে, মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে তারা বিদেশী শত্রুদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা ইউ-রোপীয়দের ওপর বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালাতে থাকে। ১৯০০ সালে রাজধানী পিকিংয়ে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসসমূহ বক্সারদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মিলিত বাহিনী পিকিং অধিকার করে দূতবাসসমূহ অবরোধ মুক্ত করে। বিদেশী বাহিনী চীনাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য নৃশংস অত্যাচার চালায়। চীন সরকারের ওপর প্রচুর ক্ষতি পূরণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। নানা অপমানজনক শর্তও চীন সরকারকে মেনে নিতে হয়।

বিদেশী ঐতিহাসিকেরা এই আন্দোলনকে বক্সার বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ভুল। বিদ্রোহ বলতে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বোঝায়। কিন্তু বক্সাররা চীনে মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। তাই একে সঠিক অর্থে বক্সার বিদ্রোহ বলা চলে না।

**জুসির সংস্কার প্রচেষ্টাঃ** বক্সার আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশীদের বিতাড়ন প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এবং তার শোচনীয় পরিণতি চীনের প্রকৃত শাসনকর্তী বিধবা সাম্রাজ্ঞী জুসিকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি বুঝতে পারেন যে, চীনকে বিদেশী আক্রমণ এবং শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অন্তত কিছু যুগোপযোগী সংস্কার

ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯০২ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে এই মর্মে তিনি চেষ্টাও করেন। সে সময় একদল চীনা বুদ্ধিজীবী বলতে থাকেন যে, চীনে ও জাপান এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত সংবিধান চালু করা দরকার। এই মত গ্রহণ করে শাসক শ্রেণীর প্রকৃত ক্ষমতা বজায় রেখে এক সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব জুসি এক উপদেষ্টা মণ্ডলীর উপর অর্পণ করেন। ১৯০৮ সালে তাঁরা একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ণও করেন। কিন্তু ঐ বছরই অল্প সময়ের ব্যবধানে সম্রাট কুয়াং সু এবং বিধবা সাম্রাজ্ঞী জুসির মৃত্যু ঘটলে যুগোপযোগী সংস্কার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে চীনের আধুনিকীকরণ এবং মাঞ্চু বংশকে পুনরায় শক্তিশালী করে তোলার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

**১৯১১ সালের বিপ্লব :** জুসি প্রতিক্রিয়াশীল হলেও শাসন ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মাঞ্চু অপশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা গেল না। বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের কথা বলা হলেও চীনারা মাঞ্চু শাসনের উচ্ছেদের জন্য ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠতে থাকে। এই বিক্ষোভ ১৯১১ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তখন চীনের শিশু সম্রাট ছিল সুয়ান তুং। তাঁর অভিভাবক প্রিন্স চুন ছিলেন অযোগ্য ব্যক্তি।

১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে হ্যানকৌয়ে বিপ্লব শুরু হয়ে দ্রুত তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবের অগ্রগতি রোধ করতে অসমর্থ হয়ে মাঞ্চু শাসকগোষ্ঠী ইউ-য়ান্ সিকাই-এর সাহায্য চায়। ইউ-য়ান্ একদিকে বিপ্লবী এবং অপরদিকে মাঞ্চু শাসকদের সাথে আলোচনা চালিয়ে মাঞ্চু রাজবংশকে চীনের সিংহাসন ছাড়তে স্বীকৃত করে। অপরদিকে সম্রাট ও মাঞ্চু অভিজাতরা বার্ষিক বৃত্তিলাভের এবং অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগের প্রতিশ্রুতি পায়।

**প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা :** মাঞ্চু বংশ সিংহাসনের ওপর দাবি

ছেড়ে দেওয়ার পর চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল ( ১৯১২ )। বিপ্লবী প্রতিনিধিরা প্রথমে চীনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা সান-ইয়াৎ সেনকে তাদের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করে। কিন্তু চীনের সর্বাধুনিক সৈন্য দলের নেতা ইউ য়ান্ সিকাইও চীনের রাষ্ট্রপতি হতে আগ্রহী ছিলেন। এই সময় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হলে নব-গঠিত প্রজাতন্ত্রের ক্ষতি হবে বিবেচনা করে সান্-ইয়াৎ সেন স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে ইউ-য়ান্ সিফাইকে ঐ পদ প্রদানের জন্য তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দেন। সেই উপদেশ অনুযায়ী বিপ্লবী পরিষদ ইউ-য়ান্কেই রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করে। এইভাবে আত্মত্যাগের মাধ্যমে চীনে এক মহান প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সান্-ইয়াৎ-সেন চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর সেই চেষ্টা তখনি ফলপ্রসূ হয় নি।



সান ইয়াৎ-সেন

## জাপান

জাপানে দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে বহির্বিশ্ব থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলপ্রয়োগের প্রচ্ছন্ন হুমকির সাহায্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমোডোর পেরী জাপানকে তার বদ্ধ দরজা উন্মুক্ত করতে বাধ্য করে ( ১৮৫৪ )।

**মেইজি যুগে সম্রাটের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা :** জাপানের রাজবংশ ছিল দীর্ঘদিনের প্রাচীন। জাপানীরা তাদের রাজাদের দেবতার বংশোদ্ভব বলে গভীর শ্রদ্ধা করত, কিন্তু জাপান উন্মুক্ত

হওয়ার আগে কয়েক শতাব্দী ধরে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিল সেখানকার বংশানুক্রমিক সেনাপতি-মন্ত্রী সোগুণদের হাতে।

বিদেশীদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করতে হওয়ায় গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাপানীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। এই লাঞ্ছনার জন্য তারা দায়ী করে দেশের প্রকৃত শাসন সোগুণদের। সোগুণদের বিরুদ্ধে দেশের জনমত ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করে তা সম্রাটের হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হয়। সেই সময় সম্রাট ছিলেন মেইজি। তাই এই ঘটনা মেইজি যুগে সম্রাটের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা নামে পরিচিত। এই সময় থেকে জাপান দ্রুত এক আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে।

**জাপানের আধুনিকীকরণ :** নব্য জাপানের শাসকেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সমকক্ষতা অর্জন করতে হলে জাপানকেও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ক্ষেত্রে বিবিধ যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশেকে এক আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়।

**রাজনৈতিক পরিবর্তন :** সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্থলে দেশে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। সম্রাটকে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় বটে, কিন্তু কার্যত তাঁর নামে তাঁর উপদেষ্টারাই রাজ্য শাসন করতেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত সংবিধানে এই বিধি অনুমোদিত হয়। সমগ্র দেশে একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য এক শক্তিশালী আমলাতন্ত্র গঠিত হল। শাসনের সুবিধার জন্য সারা দেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ শাসনের জন্য কেন্দ্র কর্মচারী নিযুক্ত করত।

**অর্থনৈতিক পরিবর্তন :** দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে জাপানকে এক আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বিবিধ

ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সরকারী সহায়তায় ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হল। রেল ও টেলিগ্রাফ লাইন প্রভৃতি নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হল। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার করে দশমিক মুদ্রার প্রচলন করা হল। একটি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হল।

শিল্পোন্নয়নের কালে জাপানে এক শিল্পপতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সেখানকার কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পপতি পরিবার মিলে 'জাইবাৎসু' নামক এক সংস্থা গঠন করে। জাইবাৎসু দীর্ঘকাল ধরে জাপানের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

সামাজিক পরিবর্তন: মেইজি আমলে সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে জাপানের সামন্ত প্রভুরা স্বেচ্ছায় তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করে এবং তাদের জমিদারী সরকারের হাতে অর্পণ করে। যোদ্ধা সামুরাই শ্রেণী এতদিন যে সব বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছিল তাও আর থাকল না। এর ফলে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে তার জায়গায় নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটল।

**সামরিক পরিবর্তন:** নব্য জাপানের নায়কেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের সমকক্ষতা অর্জন করতে হলে জাপানের সামরিক শক্তিকে আধুনিক পদ্ধতিতে গড়তে হবে। স্থল বাহিনীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথমে ফরাসী এবং তারপর জার্মান সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠনের জন্য ব্রিটিশ নৌ-বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করে জাপানের এক জাতীয় সৈন্য-বাহিনী গঠিত হয়। এতদিন কেবল সামুরাই শ্রেণীর থেকে যোদ্ধা নিয়োগ করা হত। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রথমে বাইরে থেকে আমদানি তারপর দেশেই উৎপন্ন করার ব্যবস্থা হয়। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সামরিক দিক দিয়ে জাপান এক শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়।

**চীন জাপান যুদ্ধ এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রাসারণ :** পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে শক্তিশালী হওয়ার সময় থেকেই জাপান এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে হলে জাপানের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন ছিল কোরিয়ার ওপর অধিকার স্থাপনের। তাই জাপানী নায়কেরা কোরিয়ার অধিকার স্থাপনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। সেই কোরিয়া কার্যত স্বাধীন হলেও নামে চীন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করত। তাই জাপান কোরিয়ার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকলে চীনের সাথে তার মতান্তর দেখা দেয়। এই মতান্তরকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত চীনের সথে জাপানের যুদ্ধ বাধে। চীন জাপান যুদ্ধে ( ১৮৯৪-৯৫ ) চীন পর্যুদস্ত হয়। সিমোন্‌সেকির সন্ধির মাধ্যমে ( ১৮৯৫ ) যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধির শর্তমত চীন কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জাপানকে প্রচুর অর্থ এবং বেশ কিছু এলাকাও দিতে রাজী হয়। অবশ্য রাশিয়া, ফ্রান্স এবং জার্মানি এই তিনটি শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে জাপান বিজিত এলাকার এক গুরুত্ব পূর্ণ অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে এ সত্ত্বেও চীন জাপান যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের প্রথম সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণ শুরু হয়।

**ইঙ্গ-জাপ চুক্তি :** রাশিয়ার নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তির হস্তক্ষেপের পর থেকেই জাপান বুঝতে পারে যে, সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে তার সবচেয়ে বড় শত্রু হল রাশিয়া। তাই সে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মিত্রের অন্বেষণ করছিল। দূর প্রাচ্যে এবং ভারত সীমান্তে রুশ কার্যকলাপে শঙ্কিত হয়ে ব্রিটেনও ঐ এলাকায় এক মিত্রের সন্ধান করছিল। অবশেষে ব্রিটেন এবং জাপান দূর প্রাচ্যে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি ইঙ্গ-জাপ চুক্তি ( ১৯০২ ) নামে পরিচিত। ইঙ্গ-জাপ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দূর প্রাচ্যে রাশিয়া নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এই চুক্তিতে ব্রিটেন কোরিয়ায় জাপানের বিশেষ অধিকার মেনে

নেওয়ায় পরবর্তিকালে জাপানের পক্ষে কোরিয়া দখল করা সহজ হয়।

ইঙ্গ-জাপ চুক্তির প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তির সাথে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত করায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

রুশ-জাপান যুদ্ধঃ ত্রিশক্তির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জাপানকে চীনের কাছ থেকে বিজয় সূত্রে পাওয়া অঞ্চলসমূহ থেকে বঞ্চিত করার অল্প দিন বাদে রাশিয়া পোর্ট আর্থার এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল ইজারা হিসাবে চীনের কাছ থেকে গ্রহণ করে। বক্সার হাঙ্গামার পর সে চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতেও উদ্যত হয়। কোরিয়ার ওপরেও রাশিয়া তার প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। এই সব ঘটনায় বিচলিত হয়ে জাপান প্রথমে রাশিয়ার সাথে বোঝাপড়ায় আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে রুশ জাপান যুদ্ধ ( ১৯০৪-০৫ ) শুরু হয়। যুদ্ধে রাশিয়ার ঘটল শোচনীয় পরাজয়। অবশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় পোর্টস্মাউথের চুক্তির ( ১৯০৫ ) মাধ্যমে রুশ জাপান যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধিতে রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের প্রভাব স্বীকার করে নিল। সে শাখালিন দ্বীপ জাপানকে সমর্পণ করল। পোর্টসমাউথ চুক্তির পরিণতি স্বরূপ জাপান চীনের কাছ থেকে পেল পোর্টআর্থার এবং দাইরেন সহ লিয়ার টং উপদ্বীপের এক বড় অংশ।

পর পর চীন এবং রাশিয়াকে দুটি যুদ্ধে পরাজিত করে জাপান কোরিয়ার ওপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান আনুষ্ঠানিক ভাবে কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং জাপানের একুশ দফা দাবি :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটেনের মিত্র হিসাবে জাপান এই যুদ্ধে যোগ দেয় এবং চীন ও দূর প্রাচ্যের অন্যত্র অবস্থিত জার্মান উপনিবেশসমূহ দখল করে। এই যুদ্ধে অপর সমস্ত প্রধান শক্তির দৃষ্টি যখন অন্যত্র নিবদ্ধ তখন সেই সুযোগে জাপান দুর্বল চীনের ওপর একুশ দফা সম্বলিত এক দাবি পেশ করে। এই 'একুশ দফা দাবি' ছিল পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে চীনে জার্মান অধিকৃত স্থানগুলি জাপানের প্রভাবাধীনে আনার কথা, দ্বিতীয় ভাগে পোর্ট আর্থার দাইরেন ও সন্নিহিত এলাকায় জাপানী ইজারার সময়সীমা ৯৯ বৎসর বাড়ান। তৃতীয় ভাগে মধ্যচীনে জাপান ও চীনের যৌথ মালিকানায় এক সুবৃহৎ লৌহ কারাখানা স্থাপন এবং চতুর্থভাগে চীনের কোন বন্দর বা দ্বীপ তৃতীয় কোন শক্তিকে বিক্রি বা হস্তান্তর নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়। পঞ্চমভাগে চীনে জাপানী প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সেখানে জাপানী উপদেষ্টা নিয়োগ, ইয়াংসি উপত্যকায় শান্তিরক্ষার জন্য সম্মিলিত চীনা ও জাপানী পুলিশ বাহিনী গঠন ইত্যাদির দাবি জানান হয়। পঞ্চম ভাগটি বাদে অন্যান্য দাবি-সমূহের অনেকখানি চীন মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে চীনের ওপর জাপানের নাগপাশ আরও দৃঢ়বদ্ধ হল এবং চীনকে সম্পূর্ণ পদানত করার জন্য জাপান সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) অহিফেন যুদ্ধ ও নানকিং-এর শান্তি চুক্তি বিষয়ে সংক্ষেপ লিখ।

(খ) তাইপিং বিদ্রোহ পর্যালোচনা কর।

(গ) 'শতদিনের সংস্কার' বলতে কি বোঝায়? কারা কেন কিভাবে বক্সার আন্দোলন সংঘটিত করে?

(ঘ) কোন্ কোন্ পরিবর্তনের সাহায্যে নব্য জাপানের শাসকেরা কিভাবে দেশকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

(ঙ) রুশ জাপান যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(চ) জাপানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরিচয় দাও।

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) নানকিং শান্তি চুক্তির পাঁচটি সন্ধিবন্দর কি কি ছিল? কার কার সঙ্গে এই শান্তি চুক্তি হয়?

(খ) তাইপিং কথাটির অর্থ কি? তাইপিং আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? কোন্ ঘটনার পর তিনি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হন?

(গ) বক্সার আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা কে ছিলেন? গুপ্ত সমিতিটির নাম কি ছিল? বক্সার নামটি কোথা থেকে আসে? বক্সারের জিগির কি ছিল?

(ঘ) কোন চুক্তির মাধ্যমে রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান হয়? সন্ধির শর্ত কি কি ছিল?

(ঙ) জাপানের 'একুশদফা দাবি'র পাঁচটি ভাগ কি কি ছিল?

**৩। টীকা লিখ :**

(ক) সান-ইয়াৎ-সেন, (খ) জাইবাৎসু, (গ) অতি রাষ্ট্রিক সরকার (ঘ) টিয়েনসিন চুক্তি।

**৪। সঠিক উত্তরের পাশে দাগ দাও :**

(ক) পাঁচটি 'সন্ধি বন্দর' উন্মুক্ত হয় ইংরেজদের/জাপানীদের/বিদেশীদের বসবাস ও ব্যবসার জন্য।

(খ) ইংরাজ ও ফরাসীরা ছাড়াও রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের স্বার্থেও চীন——স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

(গ) তাইপিং বিদ্রোহে প্রায়—লোকের প্রাণহানি ঘটে। এই বিদ্রোহ—বংশের শাসনের ভিত টলিয়ে দেয়।

(ঘ) ইঙ্গ-জাপ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে—প্রাচ্যে—নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে।

———

একাদশ অধ্যায়

# ব্রিটিশ রাজের অধীনে ভারত ( ১৮৫৮-১৯১৪ )

**নূতন শাসন ব্যবস্থা :** ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের ন্যায় বিশাল এক দেশের শাসন ভার যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের হাতে রাখা ঠিক নয় তা ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেন। এর ফলে ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটল। ১৮৫৮ খ্রীঃ ২রা আগষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত ভারত শাসন আইন বলে শাসনভার ইংলেণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। এই আইনে বলা হয় যে, ব্রিটিশ রাজ্যের তরফে ভারত সচিব নামক এক মন্ত্রী এক পরামর্শ দাতা কমিটির সহায়তায় ভারত শাসনের কাজ চালাবেন। এখন থেকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল উপাধি হল ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি। প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদের এক বিরাট দরবারে মহারাণীর এক ঘোষণা বাণী প্রচার করেন। এতে বলা হয় যে, অতঃপর ন্যায়বিচার, সর্ব-সাধারণের কল্যাণ, ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা ও উদারতা রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র হবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয় উচ্চ রাজকার্য পাওয়ার অধিকারী বলে স্বীকৃত হল। মহারাণীর ঘোষণাপত্র ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের মহাসনদের সঙ্গে তুলনীয়।

ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খার সাথে পরিচয় না থাকার বিপদ ইংরাজ শাসকেরা উপলব্ধি করেছিলেন। এই ত্রুটি দূর করার জন্য ১৮৬১ সালে এবং ১৮৯২ সালে দুটি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাশ করা হয়। এতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে সাহায্য করার

জন্য গঠিত কাউন্সিলগুলিতে সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। কিছু বেসরকারী ভারতীয়ও যাতে কাউন্সিলের সদস্য হতে পারে সে ব্যবস্থাও করা হয়।

**মর্লে-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)ঃ** ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসীদের কিছুটা শান্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে ভারত সচিব লর্ড মর্লে এবং ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর উদ্যোগে এক শাসন সংস্কার প্রচলিত হয়। এটি মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কার নামে পরিচিত। এই সংস্কার আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের মোট সদস্য এবং নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা বাড়ান হল। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সময় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন নীতির প্রবর্তন জাতীয় ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করে।

**স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনঃ** ১৮৫৮ সালের পর প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে আর্থিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। তবে ১৮৭০ সালের পর থেকে এর পরিবর্তন শুরু হয়। ঐ বৎসর কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্ব আদায় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে পৃথক অবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে লর্ড রিপনের আমলে। ইংলণ্ডের প্রচলিত ব্যবস্থার অনুকরণে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রিপন ১৮৮২ সালে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। এতে প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা বোর্ড এবং প্রতি তহশীল বা তালুকে বোর্ড স্থাপিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সেগুলির সংস্কার প্রভৃতি ছিল ঐ সকল বোর্ডের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ করে মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন সমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা এবং দায়িত্ব বাড়ান

হল। রিপনের প্রবর্তিত সংস্কার মোটামুটিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

**সৈন্যবিভাগে পরিবর্তন :** সিপাহী বিদ্রোহের যাতে পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে সেজন্য সৈন্যবিভাগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হল। সৈন্যবাহিনীতে বৃটিশ সেনানীদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীতে কেবল ইউরোপীয়দেরই গ্রহণ করা হত। ভারতীয়রা সাধারণতঃ সুবেদারের চেয়ে উচ্চপদে উঠতে পারত না। ভারতীয় জাতিসমূহকে সামরিক এবং অসামরিক এই দুভাগে চিহ্নিত করে যাদের ওপর ইংরাজ শাসকেরা বিশ্বাস রাখতে পারত না, তাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে যাতে ঐক্যবোধ জন্মাতে না পারে সেজন্য জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী, বর্ণ প্রভৃতির মধ্যে বিভেদ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

**শাসনতান্ত্রিক নীতি :** সাধারণভাবে বলা যায়, বিদ্রোহের পর মুখে উদারতার আশ্বাস দেওয়া হলেও কার্যতঃ শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করা হল। সিভিল সার্ভিস এবং সৈন্যবাহিনীতে উচ্চতর পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করা হয়। শাসনের মূল ক্ষমতা ইংরাজদের হাতে রেখে নীচের দিকে কিছু পদ ভারতীয়দের দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা হল।

**সাম্রাজ্য বিস্তার :** ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংরাজরা ভারত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য কয়েকটি রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। লর্ড ডালহৌসীর আমলে দক্ষিণ ব্রহ্ম অধিকৃত হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ব্রহ্মরাজ থিবোর কুশাসন, ইংরাজ বণিকদের ওপর দুর্ব্যবহার প্রভৃতি কারণ উপলক্ষ্য করে ইংরাজরা ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। থিবো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন এক ঘোষণা

দ্বারা উত্তর ব্রহ্ম অধিকার করেন। এর পর সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তকে সম্ভাব্য রুশ অনুপ্রবেশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগানি-



ডালহৌসি



লর্ড বেন্টিক

স্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হলেও ইংরাজ শক্তি আফগানিস্থানের কোন অংশকে কুক্ষিগত করতে পারে নি। তবে এই যুদ্ধও পরবর্তিকালে মার্টিমার ডুরাণ্ডের প্রচেষ্টায় ডুরাণ্ড সীমারেখার নির্ধারণ (১৮৯৩ খ্রীঃ) ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তকে স্থিতিশীল করে ও নিরাপত্তা দেয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন তিব্বতে ইয়ং হাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। প্রাথমিক সংঘর্ষে তিব্বতীয়রা পরাজিত হয় এবং ইয়ং হাজবেণ্ড মিশন লাসায় প্রবেশ করে। এই অভি-যানের ফলে সাম্রাজ্য বিস্তার না ঘটলেও ইংরাজরা তিব্বতে কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে।

**উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কার ঃ** উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বহু ভারতীয় মনীষী যুগোপযোগী সমাজ সংস্কারের

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন সংস্কারকে কার্যকরী করার চেষ্টাও তাঁরা করেন।

যে সব মনীষী এই সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রণী ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে রামমোহনের সংস্কার প্রচেষ্টা



রাজা রামমোহন রায়



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রশংসনীয়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ ও কৌলিন্য প্রথা, জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রভৃতি তৎকালীন প্রচলিত বহু কুপ্রথার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধানত তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় লর্ড বেন্টিক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে এক আইন প্রণয়ন করেন। তিনিই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পূর্বসূরী, ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতা।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। সমাজ সংস্কারের যে মহান ধারা রামমোহন প্রবর্তন করেন ঈশ্বরচন্দ্র সেই ধারাকে অব্যাহত রাখেন। মুখ্যত তাঁরই চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবার পুনর্বিবাহ আইনত সিদ্ধ বলে স্বীকৃত হয়। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারেও তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তাঁর সহযোগিতায় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন।



ডিরোজিও

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডি রো জি ও (১৮০৯-১৮৩১) নামক হিন্দু কলেজের জনৈক শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন অন্যায় অবিচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে উদ্বুদ্ধ করেন। 'ইয়ং-বেঙ্গল' নামে পরিচিত তাঁর শিষ্যরা পরবর্তিকালে সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, শিক্ষা বিস্তার, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজ অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদের প্রচলন, পর্দা প্রথার অবসান, মহিলাদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করে। মাধব গোবিন্দ রাণাডে প্রতিষ্ঠিত প্রার্থনা সমাজ অস্পৃশ্যতা বর্জন, আন্তঃবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের উন্নয়ন প্রভৃতির চেষ্টা করে। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হল 'শুদ্ধি' অনুষ্ঠানের প্রবর্তন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে আর্তের সেবা ও যুগোপযোগী সংস্কারমূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। আলিগড় আন্দোলনের স্রষ্টা স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষাকে খোলা মনে গ্রহণ করার আহ্বান জানান। আধুনিক পাশ্চাত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সাথে ভারতীয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের এক আন্তরিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও তিনি করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে তা প্রথমে সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে। সেদিক দিয়ে বিচার করলেও এইসব সংস্কার প্রচেষ্টার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট।

**জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ :** এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের দুই মহান চিন্তাধারা-গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ-শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তারা উপলব্ধি করে যে, প্রতিটি জাতির স্বাধীনতার অর্জনের এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে। এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতে আধুনিক জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয়। সমগ্র ভারত জুড়ে ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রসারের পক্ষে সহায়ক হয়।

**ভারতের জাতীয় কংগ্রেস :** ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দ্রুতগতিতে পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায়।

অবসরগ্রহণকারী ইংরাজ সিভিলিয়ান এ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারূপে খ্যাত। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ যাতে বৈপ্লবিক পথে না গিয়ে শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয় সে উদ্দেশ্যে হিউম কংগ্রেসের মত এক সংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অবশ্য পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারতীয় নেতারা ভারতবাসীর ন্যায্য আশা আকাঙ্ক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এরূপ এক সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা আগেই শুরু করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ফিরোজ শা মেহতা, দাদাভাই নৌরজী প্রমুখ নেতাদের এবং পুণা সার্বজনিক সভা, মাদ্রাজ মহাজন সভা, ভারত সভা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সারা ভারতের এক শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এবং শক্তিসমূহ কংগ্রেসের মাধ্যমে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম দিকের কংগ্রেসী নেতাদের ইংরাজদের সদিচ্ছার ওপর আস্থা ছিল। তাই তাঁরা জাতীয় দাবী আদায়ের জন্য অপেক্ষাকৃত মৃদু পন্থা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী, দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

**চরমপন্থী আন্দোলন** (১৯০৫-১৯১৪): প্রথমদিকে কংগ্রেসী নেতাদের মনে ইংরাজদের সদিচ্ছার প্রতি আস্থা থাকলেও ক্রমশঃ তা হ্রাস পায় এবং কংগ্রেসের ভেতর সংগ্রামী মনোভাব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে কেবলমাত্র সংগ্রামের পথেই জাতীয় মুক্তি আসতে পারে তাঁরা সাধারণভাবে চরমপন্থী নামে পরিচিত হন। চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল। তাই সেই সময় চরমপন্থী দলকে লাল-বাল-পাল দল বলেও অভিহিত করা হত।

১৯০৫ সালে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে দুভাগে বিভক্ত করেন। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে বিরাট গণবিক্ষোভ

দেখা দেয় তা চরমপন্থী আন্দোলনের শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। চরমপন্থীরা তিনটি নীতিতে বিশ্বাস করতেন। প্রথমতঃ পরাধীনতার



লালা লাজপৎ রায়



বিপিনচন্দ্র পাল

গ্লানি দূর করার উদ্দেশ্যে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ অর্জন। তৃতীয়তঃ, জনগণের ওপর তাঁদের গভীর আস্থা ছিল এবং তারা গণজাগরণের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভে উদ্যোগী হন। স্বরাজ অর্জনের জন্য তাঁরা সাহস, আত্ম-বিশ্বাস এবং স্বার্থত্যাগের ওপর জোর দিতেন।



বালগঙ্গাধর তিলক

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা গ্রহণ করতে পারেন নি। তাই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাই কংগ্রেসে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের ভেতর বিচ্ছেদ ঘটে। এই ঘটনা ইতিহাসে সুরাই বিচ্ছেদ নামে পরিচিত।

চরমপন্থী আন্দোলনের প্রসারের সাথে সাথে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাংলা,

পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রেই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সর্বাপেক্ষা তীব্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

## অনুশীলনী

**১। সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশরাজ যে নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে এবং সৈন্য বিভাগে ভারতে ব্রিটিশের যে নয়া ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(গ) উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কী ছিল ?

(ঘ) ভারতের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রকাশ ও আন্দোলনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় মতের সমর্থকদের ক্রিয়াকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) মর্লে-মিণ্টো সংস্কার বলতে কি বোঝায় ? কে কে এই আইনের প্রবক্তা ? কবে এই আইন প্রচলিত হয় ?

(খ) ভারত-শাসন আইন কবে কে স্বহস্তে গ্রহণ করেন ? ভারত শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকে কার ?

(গ) ডিরোজিও কে ছিলেন ? তাঁর শিষ্যরা কী নামে পরিচিত ছিলেন ? তাদের ভূমিকা কী ছিল ?

(ঘ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় কত খ্রীষ্টাব্দে ? কে ইহার প্রতিষ্ঠাতা ? কার সভাপতিত্বে কত খ্রীষ্টাব্দে কোথায় প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ?

(ঙ) লাল-বাল-পাল বলতে কাদের বোঝাত ? তাঁরা কোন তিনটি নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন ?

**৩। সঠিক উত্তরটির পাশে দাগ দাও।**

(ক) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট ভারতের শাসনের ভার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের/ইংলণ্ডেশ্বরীর/ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে যায়।

(খ) ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিণ এক ঘোষণা দ্বারা দক্ষিণ ব্রহ্ম উত্তর ব্রহ্ম/ব্রহ্মদেশ অধিকার করেন।

(গ) দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ হয় ১৮৭৮/১৮৮৫/১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে।

(ঘ) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাণী রাসমণি/রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব/স্বামী বিবেকানন্দ।

(ঙ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতির নাম উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী/সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী/অক্টোভিয়ান হিউম।

৪। **সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর:**

(ক) চরমপন্থী নেতাদের অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

(খ) স্বরাজ অর্জনের জন্যই চরমপন্থীরা সাহস, আত্মবিশ্বাস ও স্বার্থত্যাগের ওপর জোর দিতেন।

(গ) সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন রামমোহন রায়।

(ঘ) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের ঘটনার পর থেকেই জাতীয় চেতনা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

৫। **টীকা লিখ:**

(ক) সতীদাহ প্রথা, (খ) ব্রাহ্ম সমাজ (গ) অক্টোভিয়ান হিউম

(ঘ) আলিগড় আন্দোলন।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়

# প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

**কারণ:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বর্তমান যুগের এক বিরাট ঘটনা। ইউরোপে শুরু হয়ে ক্রমে এই যুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। সেইজন্য এই যুদ্ধকে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পেছনে বহু কারণ ছিল।

জাতীয়তাবাদের প্রসার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক প্রধান কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে গর্বিত জার্মান জাতি নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অন্যান্য দেশ বা জাতিকে পদানত করতে চাচ্ছিল। এদিকে বলকান্ উপদ্বীপ ও মধ্য ইউরোপের কয়েকটি জাতি বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখছিল। আবার জার্মানির কাছে আলসাস ও লোরেন প্রদেশ হারিয়ে ফরাসী

জাতীয়তাবাদ প্রতিশোধের বাসনায় উগ্র হয়ে ওঠে। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের বিস্তার ইউরোপ তথা বিশ্ব রাজনীতিতে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করে তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রস্তুত করেছিল।

পরস্পর বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রসারের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। নিজ নিজ নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করার জন্য ইউরোপের বৃহৎ শক্তিসমূহ ট্রিপল এ্যালায়েন্স এবং ট্রিপল আঁতাত নামে ছুটি বিরোধী শক্তি জোট গঠন করে। বৃহৎ শক্তিবর্গ এইভাবে ছুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তি শিবিরে বিভক্ত হওয়ায় সমগ্র বিশ্ব এক ভয়াবহ সংঘর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠতে থাকায় বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় তাও আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলতে সাহায্য করে।

বিশ্বের প্রধানশক্তি হিসাবে জার্মানির আত্মপ্রকাশের চেষ্টা বৃটেনকে শঙ্কিত করে। নৌ-শক্তির প্রাধান্যের প্রশ্নেও তীব্র ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। বলকান্ এলাকায় প্রভুত্বের প্রশ্নে রাশিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার সম্পর্কও ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠেছিল, এছাড়া ফারসী জার্মান চিরন্তন শত্রুতা ত ছিলই। এইভাবে বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির মধ্যে সন্দেহ, ঈর্ষা শত্রুতার বৃদ্ধি প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

প্রত্যক্ষ কারণঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রত্যক্ষ কারণ হল অষ্ট্রিয়ার সাথে সার্বিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জুন বসনিয়ার রাজধানী সেরাজোভা শহরে অষ্ট্রিয়ার ফ্রান্সিস ও তাঁর পত্নী বসনিয়ান সন্ত্রাসবাদী রাজভিলে প্রিন্সেপের হাতে নিহত হয়। সার্বিয়ার উস্‌কানিতে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে, এই সন্দেহে অষ্ট্রিয়া জার্মানির পূর্ণ সমর্থনসহ সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে (২৮ শে জুলাই, ১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

**যুদ্ধের ব্যাপকতা ঃ** রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে, ফ্রান্স রাশিয়া ও সার্বিয়ার দিকে এবং জার্মানি অস্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জার্মানি আন্তর্জাতিক চুক্তি অমান্য করে বেলজিয়াম আক্রমণ করলে ইংলণ্ডও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ক্রমে বুলগেরিয়া ও তুরস্ক জার্মানির পক্ষে এবং জাপান, ইটালি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ 'মিত্রশক্তি'র ( অর্থাৎ রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের ) পক্ষে যোগ দিল। এইভাবে বলকান্ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ শুরু হয় তা এক বিরাট বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চার বছর ( ১৯১৪-১৮ ) ধরে চলেছিল। এই যুদ্ধের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় ; প্রথম মহাযুদ্ধ বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশ এবং সমুদ্রবক্ষের এক বিরাট অংশ জুড়ে চলে ; ইতিপূর্বে আর কোন যুদ্ধই এত ব্যাপক আকার ধারণ করে নি। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধ জয়ের প্রচেষ্টা এর আর এক বৈশিষ্ট্য। উন্নত বৈজ্ঞানিক ভয়াবহ মারণাস্ত্র—যেমন বিষাক্ত গ্যাস, ট্যাঙ্ক, ডুবো জাহাজ, এ্যারোপ্লেন প্রভৃতির ব্যবহার এবং স্থল, জল, অন্তরীক্ষে যুদ্ধ পরিচালিত হওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

এই যুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্যের পর জার্মানির কাছে তার মিত্রদেশ-গুলি চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মিত্রপক্ষীয় দেশ রাশিয়াও যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং সেখানে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটে।

**ফল ঃ** প্রথম মহাযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ ফল হল জাতীয়তাবাদী নীতির জয়। যুদ্ধের পর ইউরোপে জাতয়তাবাদের ভিত্তিতে বহু রাষ্ট্র গঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী নীতি স্বীকৃত হওয়ার সাথে সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদেরও প্রসার ঘটে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা এর পক্ষে সহায়ক হয়। রুশ বিপ্লব এবং যুদ্ধোত্তর বিশ্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন দেশের মেহনতী মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। যুদ্ধের পর রাশিয়া, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক

প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে। এই ঘটনা পরিণামে গণতন্ত্র প্রসারের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

যুদ্ধের ফলে যে বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় তার প্রভাব দীর্ঘকাল ধরে চলে। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা বিভিন্ন দেশে একনায়কতন্ত্র প্রসারের পথ প্রশস্ত করে যুদ্ধের পর বিজিত দেশসমূহের ওপর যে সব অতি কঠোর সন্ধি সর্তসমূহ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে ঐ সব অধিবাসীদের বিশেষ করে জার্মানদের মনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে দেখা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফল হয় সুদূর প্রসারী এবং এর প্রভাব পরবর্তী দীর্ঘকাল ধরে অনুভূত হয়েছিল।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পিছনের কারণগুলি বর্ণনা কর।

(খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা বর্ণনা কর। এর ফল কতদূর সুদূরপ্রসারী হয়েছিল ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ?

(খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন্ পক্ষে কে ছিল ? কতদিন ধরে এই যুদ্ধ চলছিল ?

(গ) যুদ্ধের পর কোন্ কোন্ দেশে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে ? যুদ্ধে 'মিত্রশক্তি' কারা ছিল ?

৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) জার্মানির কাছে —— ও —— প্রদেশ হারিয়ে ফরাসী জাতীয়তাবাদ প্রতিশোধের বাসনায় উগ্র হয়।

(খ) বলকান্ এলাকায় প্রভুত্বের প্রশ্নে —— সাথে ——সম্পর্কও ক্রমশঃ তিক্ত হয়ে উঠছিল।

(গ) রাশিয়া —— পক্ষে, —— রাশিয়াও —— দিকে এবং জার্মানি —— পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৪। **বিশেষ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ইউরোপের বৃহৎ শক্তিসমূহ যে দুটো বিরোধী শক্তিজোট গঠন করে, সেগুলোর নাম কি ?

(খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কি কি মরণাস্ত্র ব্যবহৃত হয় ?

## ত্রয়োদশ অধ্যায়
## রুশ বিপ্লব

**বিপ্লবের পটভূমি ঃ** ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পটভূমি দীর্ঘ দিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে স্বৈরাচারী জার সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মনে বিক্ষোভ জমতে থাকে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এক ঘোষণা বাণী প্রচারের দ্বারা রাশিয়ার কৃষকদের 'সার্ফ' বা ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু 'মীর' নামক এক যৌথ সংস্থার তত্ত্বাবধানে তাদের স্থাপন করার ফলে কৃষকদের কোন আর্থিক উন্নতি ঘটেনি। মীরের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত বিরক্তকর হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে রাশিয়ার দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটতে থাকে। শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে শিল্পে শ্রমিক শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটে। অন্যান্য দেশের শিল্প শ্রমিকদের মত রাশিয়ার শ্রমিকেরাও তাদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার স্বীকৃত না হওয়ায় শ্রমিকেরা নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। এই অসন্তুষ্ট অথচ আংশিক সংগঠিত শ্রমিকদের অসন্তোষ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুদ্ধি-জীবীদের মত রাশিয়াতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল। গোর্কি, তুর্গেনিভ, টলষ্টয় প্রমুখ লেখক ও বুদ্ধিজীবিরা রুশবাসীদের সামনে এক গণতান্ত্রিক এবং উন্নতমানের জীবনের স্বপ্ন তুলে ধরেন। কিন্তু সরকার বুদ্ধিজীবিদের আশা-আকাঙ্খার প্রতি

কোন সহানুভূতি তো দেখায়ই নি, উপরন্তু সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং চিন্তাধারাকে দমন করার চেষ্টা করে। এর ফলে বুদ্ধিজীবীরাও জার সরকারের বিরোধী হয়ে ওঠে।

এই ভাবে বিবিধ কারণে রুশ সমাজের বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এই সময় সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী বিভিন্ন সংগঠন মিলিত হয়ে 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' গঠন করে। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিলে 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' ভেঙে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। লেনিনের সংগ্রামী নেতৃত্বে 'বলশেভিক' বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংগঠিত হল। নরমপন্থী অপর দলটি 'মেনশেভিক' ( বা সংখ্যালঘু ) নামে পরিচিত হয়।

১৯০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশ শাসনবর্গের অকর্মণ্যতার ফলে রাশিয়ার পরাজয় এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব ব্যর্থ হলেও পরবর্তী বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। লেনিন একে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহড়া ড্রেস রিহার্শাল বলে অভিহিত করেছেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যর্থ বিপ্লবের পর প্রতিক্রিয়াশীলরা নূতন উদ্যমে দমন নীতি চালায়। এর ফলে সর্বত্র শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ঘৃণা ধূমায়িত হতে থাকে। বলশেভিক দলের নেতৃত্বে শ্রমিক-শ্রেণী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসংখ্য ধর্মঘটের মাধ্যমে আঘাত হানতে শুরু করে। এই অবস্থায় জার সরকার বলশেভিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের ফলে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলেও অষ্ট্রিয়া এবং জার্মান প্রতিযোগিতা অবসানের সম্ভাবনায় শাসক শ্রেণী এই যুদ্ধকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হয় নি।

যুদ্ধের প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষককে রণাঙ্গনে পাঠান হল। এদের সামরিক শিক্ষা, প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল। ফলে সৈনিকদের প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে

ঠেলে দেওয়া হল। যুদ্ধে অসহায় অসংখ্য সৈনিকের মৃত্যুতে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়। কাঁচা মাল ও শ্রমিকের অভাবে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। কৃষকের অভাবে বহু জমি অনাবাদী পড়ে থাকল। দেশে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব। রণাঙ্গনে সৈনিকদের মধ্যে এবং দেশের ভেতর শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে বলশেভিক দলের প্রচারের ফলে সৈনিক, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকলেই বুঝতে পারল যে, জাতীয় বা জনস্বার্থের জন্য নয়, পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। তারা যুদ্ধ ও জারতন্ত্রের অবসানের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে।

**মার্চ বিপ্লব:** ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ রাজধানী পেত্রোগ্রাদে খাদ্যের দাবিতে শ্রমিকরা ধর্মঘট ও মিছিল করে। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়লে ধর্মঘটী শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়ার জন্য জার সৈন্য পাঠান। কিন্তু সৈন্যরা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। ১২ই মার্চ শ্রমিক ও সৈন্যরা মিলিতভাবে বন্দীশালা উন্মুক্ত করল এবং মন্ত্রী ও পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন বড় কর্তাকে বন্দী করল। এইভাবে ৮ই থেকে ১২ই মার্চের মধ্যে প্রায় বিনা রক্তপাতে পেত্রোগ্রাদে বিপ্লব জয়যুক্ত হল। দেশের অন্যত্রও দ্রুত এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লব দমন করার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে জার দ্বিতীয় নিকোলাস পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অতঃপর এক অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। এই সরকার রাশিয়াকে এক 'প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করল। এইভাবে রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে মেনশেভিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরাই ছিল প্রবল। প্রথমে প্রিন্স লভভ এবং তারপর মেনশেভিক নেতা কেরেনেস্কি প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় দেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

**নভেম্বর বিপ্লব :** ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ নির্বাসিত লেনিন দেশে ফিরে এসে প্রায় বিপর্যস্ত বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের এবং শান্তি স্থাপনের এবং রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের দ্বারা নির্বাচিত সোভিয়েতের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানাল। কেরেনেস্কি সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। অবশেষে বলশেভিকরা ৭ই নভেম্বর শীত প্রাসাদ অধিকার এবং কেরেনেস্কি সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করল। নতুন সোভিয়েত সরকারের প্রধান হলেন লেনিন। এইভাবে ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হল।



লেনিন

অবশ্য বিপ্লবের সংকট তখনও কাটে নি। দেশের ভেতর প্রতি বিপ্লবীরা এবং বাইরে থেকে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশ নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট ছিল। বলশেভিক বিপ্লবকে এই সংকট থেকে ত্রাণ করেন লেনিন। তিনি জার্মানের সাথে ব্রেস্ট লিটভস্কের সন্ধি (১৯১৮) দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটালেন এবং প্রতিবিপ্লবীদের এবং বিদেশী পুঁজিবাদী দেশসমূহকে প্রতিহত করে বিপ্লবকে বিপদমুক্ত করলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ক্রমে ক্রমে সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়।

**ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যত্র রুশ বিপ্লবের প্রভাব :** ১৯১৭ খ্রীঃ-এর রুশ বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর প্রভাব ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বে অনুভূত হয়। এই বিপ্লবের ফলে সব দিক দিয়ে রাশিয়ায় অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে এবং সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়।

সোভিয়েত বিপ্লবের সাফল্য এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মার্ক্সবাদের

সকল বাস্তব প্রয়োগ অন্যান্য দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগায়। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য 'কমিণ্টার্ণ' গঠন বিভিন্ন দেশে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

বিপ্লবের ঢেউ জার্মানিকেও স্পর্শ করে। লিবনেণ্ট ও রোমা লুক্সেমবুর্গের নেতৃত্বে সাম্যবাদী 'স্পার্টাকাস' আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। স্পার্টাকাস আন্দোলন দমিত হলেও জার্মানিতে সাম্যবাদী-দের প্রভাব হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। ইতালিতেও সাম্যবাদী আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুসোলিনীর ক্ষমতা দখলের পর সেখানে সাম্যবাদীদের প্রভাব প্রশমিত হয়।

যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তার জায়গায় অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এইসব দেশেও শ্রমিক ও বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাঙ্গেরীতে বেলা কুনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান অবশ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও শ্রমিক ও বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেয়। এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের কাছে সোভিয়েত বিপ্লব মুক্তির নতুন বার্তা বহন করে আনে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা বাকু শহরে সমবেত হয়। সেখানে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রসার ও ঔপনিবেশিক দেশসমূহের মুক্তি আন্দোলনের কার্যক্রম আলোচিত হয়। চীন, ইন্দোচীন, ভারতবর্ষ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সাম্যবাদী দলের উদ্ভব হয়। ভারতে সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাবে শ্রমিকদের ট্রেড

ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন আরো তীব্র হয়।

আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসকে রুশ বিপ্লব নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। এই বিপ্লব ছিল একাধারে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ায় ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বিপ্লবের পর সফল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহের মাধ্যমে রাশিয়া এক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার এই উন্নতি পৃথিবীর ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই বিপ্লব মানবজাতির কাছে এক নূতন সম্ভাবনার, নূতন আশার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা কি ছিল ?

(খ) মার্চ বিপ্লব ও নভেম্বর বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(গ) ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে রুশ বিপ্লবের প্রভাব কতখানি পড়েছিল, তা বর্ণনা কর।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) বিংশ শতকের শুরুতে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সংগঠনগুলো মিলিত হয়ে কোন্ পার্টি গঠন করে ? এই পার্টি কেন ভেঙে যায় ? বিভক্ত দলগুলো কি নামে কার নেতৃত্বে সংগঠিত হয় ?

(খ) 'মার্চ বিপ্লব' কবে কোথায় সংঘটিত হয়েছিল ? জার কেন পদত্যাগ করলেন ? তার পরিণতি কি হয়েছিল ?

(গ) নভেম্বর বিপ্লবের নেতৃত্বে কে ছিলেন ? জারের পদত্যাগের পরেও এই বিপ্লবের প্রয়োজন হল কেন ?

৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জার —— এক ঘোষণা বাণী প্রচারের দ্বারা রাশিয়ার কৃষকদের —— বা —— প্রথা থেকে মুক্তি দেন।

(খ) ——, ——, —— প্রমুখ লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা রুশবাসীদের সামনে এক উন্নতমানের —— —— তুলে ধরেন।

(গ) বলশেভিক বিপ্লবকে সংকট থেকে ত্রাণ করেন——। তিনি জার্মানের সাথে—— —— —— দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটালেন।

(ঘ) জার্মানে——ও——এর নেতৃত্বে সাম্যবাদী——আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

৪। **টীকা লিখ:**

(ক) বলশেভিক দল (খ) লেনিন।

---

## চতুর্দশ অধ্যায়

## ইউরোপ ( ১৯১৯-১৯৩৯ )

**প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন এবং ইউরোপের পুনর্গঠন:** ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জার্মানি বিনা শর্তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর মিত্র-শক্তিসমূহের প্রতিনিধিবর্গ যুদ্ধাবসানে স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের জন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক সম্মেলনে মিলিত হন। এই শান্তি-সম্মেলনে পৃথিবীর বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন। তবে সম্মেলন পরিচালনার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন 'প্রধান চারজন' নামে পরিচিত চারটি দেশের নেতারা। এঁরা হলেন যথাক্রমে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেসোঁ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন এবং ইটালির প্রধানমন্ত্রী অর্লেণ্ডো। ক্লেমেসোঁ এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

কি শর্তে এবং কি নীতির ওপর ভিত্তি করে শান্তি স্থাপিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রতিনিধিদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য ছিল। ফ্রান্স চাইল জার্মান শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে। পক্ষান্তরে আদর্শবাদী উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা নীতির ওপর ভিত্তি করে শান্তি

চুক্তি সম্পাদিত করতে চাইলেন। লয়েড জর্জ অনেকটা মধ্যপন্থা গ্রহণ করলেও তিনিও বলেন যে জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। শেষ পর্যন্ত জার্মানিকে যতদূর সম্ভব দুর্বল এবং পঙ্গু করে রাখবার নীতিই জয়ী হল।

দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জার্মানির সাথে মিত্রপক্ষের শান্তি স্থাপিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী জার্মানি ফ্রান্সকে আলসাসলোরেন, বেলজিয়ামকে ইউপেন, মেমেডি ও মোরসনেট, পোল্যাণ্ডকে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়ার অধিকাংশ এবং ডেনমার্ককে শ্লেসউইগের উত্তরাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এ ছাড়াও মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে জার্মানিকে আরও অঞ্চল হারাতে হল। জার্মানিকে তার সমস্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যও ছেড়ে দিতে হয়। ভার্সাই চুক্তি সম্পাদনের সময় জার্মান প্রতিনিধিদের মতামতকে সম্পূর্ণ জোর করে এই সব কঠোর শর্ত চাপিয়ে দেওয়ায় জার্মান জাতি ভার্সাই চুক্তিকে মেনে নিতে পারে নি।

অন্যান্য পরাজিত রাষ্ট্রসমূহের সাথে যে সব সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় সেগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে সেণ্ট জার্মাইন (সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) এবং ট্রিয়াননের সন্ধির (জুন, ১৯২০) কথা। এই দুটি সন্ধির দ্বারা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যকে ভেঙে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি করা হল। সেণ্ট জার্মাইন-এর সন্ধি দ্বারা ভিয়েনা শহর ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী এক ক্ষুদ্র জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে অষ্ট্রিয়া সাধারণতন্ত্র গঠিত হল। অষ্ট্রিয়া থেকে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া বিচ্ছিন্ন করে এক নূতন চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি ও গঠিত হল। বসনিয়া ও হারজেগোভিনা সার্বিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হল যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য। এছাড়াও অষ্ট্রিয়া ইটালিকে ত্রিয়েস্তে, ট্রেনটিনো, দক্ষিণ টাইরল এবং পোল্যাণ্ডকে গ্যালিসিয়া প্রদান করা হল। ট্রিয়াননের সন্ধি দ্বারা হাঙ্গেরীকে অষ্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্বতন্ত্র প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল। ম্যাগিয়ার ভাষাভাষী

নয় এমন কিছু অঞ্চল হাঙ্গেরী থেকে নিয়ে রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হল।

বুলগেরিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত হল নিউলির সন্ধি ( নভেম্বর ১৯১৯ )। এই সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়ার কিয়দংশ যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রীসকে দেওয়া হয়।

পরাজিত তুরস্কের সাথে স্বাক্ষরিত হয় সেভার্সের সন্ধি ( আগষ্ট, ১৯২০ )। সেভার্সের সন্ধি অতিরিক্ত কঠোর হওয়ার প্রতিবাদে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কীরা যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালায় তারই ফলে ন্যায়ের ভিত্তিতে লুসানের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

শান্তি সম্মেলন জাতীয়তাবাদী নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে এই সব চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপের মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। বহু জাতি সমন্বয়ে গঠিত সাম্রাজ্যসমূহকে খণ্ডিত করে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করা হল। রাশিয়া, জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া কর্তৃক অধিকৃত পোল ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে নিয়ে নূতন করে আবার 'পোল্যাণ্ড' রাজ্য সৃষ্ট হল। মধ্য ইউরোপে চেকোশ্লোভাকিয়া নামে এক নূতন রাজ্য জন্ম নিল। ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া রুশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল। বর্ধিত সার্বিয়া যুগোশ্লাভিয়া নামে পরিচিত হল এবং রুমানিয়া গ্রীসের এলাকা বৃদ্ধি পেল। পশ্চিম ইউরোপেও ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ডেনমার্ক জার্মানির কাছ থেকে বেশ কিছু এলাকা পাওয়ায় ঐ অঞ্চলের মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

**ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব :** যুদ্ধের পর ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইটালিকেও চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তার শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। মুদ্রাস্ফীতি এবং খাদ্যাভাবের ফলে সাধারণ লোকদের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়তে থাকে। তদানীন্তন দুর্বল ইটালিয় সরকার এই অবস্থার কোন প্রতিবিধান করতে পারে না। এদিকে একদিকে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রসার

এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান কৃষক ও শ্রমিক অসন্তোষ জমিদার, শিল্পপতি প্রভৃতি শ্রেণীর মনে ভীতির সঞ্চার করল। তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষায় সমর্থ এক শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন অনুভব করছিল। অসংগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও চাইছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সমর্থ এক সুদক্ষ সরকার। দেশের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও প্রসারের পক্ষে সহায়ক হয়।

ইটালিতে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের স্রষ্টা ও নেতা ছিলেন বেনিটো মুসোলিনী (১৮৮৩-১৯৪৫)। যুদ্ধের পর দেশ যখন অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন তখন তাঁর উদ্যোগে ফ্যাসিষ্ট দল গঠিত হয়। ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট, বেকারী বৃদ্ধি, আর্থিক দুর্দশা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি জনগণের এক বিপুল অংশের মনে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে। এই অবস্থায় দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি, আর্থিক উন্নতি, বেকার যুবকদের চাকুরী প্রদান, আইন এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও সাম্যবাদীদের বিরোধিতা করার যে নীতি ফ্যাসিষ্টরা ঘোষণা করল তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বেকার যুবক, কর্মচ্যুত সৈনিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বড় অংশ এবং জমিদার ও পুঁজিপতিরা ফ্যাসিষ্টদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসল। সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিকদের অগ্রগতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিষ্টরা 'কালো কুর্তা বাহিনী' নামক এক আধা সামরিক সংস্থা গঠন করল। ভূতপূর্ব অভিজ্ঞ সৈনিকেরা এই বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল। জমিদার ও পুঁজিপতিদের সাহায্যে এই বাহিনীর সদস্যরা যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র লাভ করল। কালো কুর্তা বাহিনী বামপন্থী দলসমূহের সভা সমিতি ভেঙে দিতে থাকে। প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রী নেতাদের ভীতি প্রদর্শন



মুসোলিনী

এমনকি তাদের ভেতর অনেককে হত্যা পর্যন্ত করা হল। অবশেষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্টরা ইটালির শাসন ক্ষমতা দখল করল।

ফ্যাসিষ্ট আমলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। দেশের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল ফ্যাসিষ্ট দল এবং দলের নেতা 'ইল ত্যুচে' উপাধিধারী মুসোলিনীর হাতে।

**জার্মানীতে নাৎসীবাদের উদ্ভব :** মতাদর্শের দিক দিয়ে ইটালির ফ্যাসিবাদের সাথে জার্মান নাৎসীবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। স্বল্প সংখ্যক উগ্র জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে এ্যাডলফ হিটলার (১৮৯৯-১৮৪৫) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক শহরে 'ন্যাশনাল সোস্যালিষ্ট জার্মান ওয়ার্কারস পার্টি' নামে এক দলগঠন করেন। বিরুদ্ধবাদীরা উপহাস করে এই দলের নাম দেয় নাৎসী দল। ভার্সাই চুক্তির কঠোর শর্তসমূহ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতি জার্মান জনগণের এক বিরাট অংশকে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল। এই অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করে নাৎসীরা শাসন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে।


এ্যাডলফ হিটলার

নাৎসী দলের ঘোষণা অনুযায়ী তাদের লক্ষ্য ছিল এমন এক বৃহত্তর 'তৃতীয় রাইম' (রাইম মানে রাষ্ট্র) গঠন করা, যার মধ্যে ইউরোপ মহাদেশের সমস্ত জার্মান জাতির লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। তাদের কর্মসূচীর ভেতর ছিল অপমানকর ভার্সাই চুক্তির সর্তসমূহ বাতিল করা, এক শক্তিশালী জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন, বলশেভিক এবং ইহুদীদের বিরোধিতা করা, কৃষি-সংস্কার, সমস্ত বড় বড় ট্রাষ্ট এবং ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর জাতীয়করণ ইত্যাদি। নাৎসীদলের এই কর্মসূচী ভূতপূর্ব সৈনিক, শিক্ষিত বেকার যুবক উচ্চ মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বিরাট অংশের চিত্তকে আকর্ষণ

করে। জার্মানিতে সাম্যবাদীদের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে জার্মান শিল্পপতিরা নাৎসী দলকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। এইভাবে নাৎসী আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীরা বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা নির্বাচনে জয়ী হলে নাৎসী নেতা হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীরা জাতীয়সভার নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সমস্ত ক্ষমতা দখল করল। অতঃপর সমস্ত বিরোধী দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গ পরলোকগমন করলে হিটলার প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদই গ্রহণ করলেন। তিনি হলেন 'ফ্যুরার' বা অদ্বিতীয় নেতা।

**জাতিসংঘ**ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সকলের মনে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে এই ধরণের যুদ্ধের বীভৎসতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকেই ভাবছিলেন। এর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন। প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই জাতিসংঘ-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত শর্তসমূহ ভার্সাই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘ বা 'লীগ অফ নেশনস' স্থাপিত হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত চুক্তির মুখবন্ধে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়। এতে বলা হয় যে জাতিসংঘে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

**জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা**ঃ জাতিসংঘের স্থায়িত্ব কালের মধ্যে ছোট ও বড় মিলে প্রায় চল্লিশটি বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব তার ওপর পড়ে। এদের মধ্যে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সমস্যা যেমন ইটালি, গ্রীস, তুরস্ক, ইরাক, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড,

লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জাতিসংঘ শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম হয়। এই বিরোধসমূহের মীমাংসা জাতিসংঘের সাফল্যের পরিচায়ক। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বিরোধের সমাধান জাতিসংঘ অতি সহজেই করতে সক্ষম হলেও যেখানে বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত থাকত সেখানেই জাতিসংঘ অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এটা তার দুর্বলতার পরিচয় দেয়। জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান, ইটালি কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ এবং জার্মানি কর্তৃক ভার্সাই চুক্তির বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের সময় জাতিসংঘ ঐ সমস্ত শক্তিশালী দেশসমূহের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিরোধেও জাতিসংঘ কোন ব্যবস্থা নিতে পারে নি। এই সব ব্যর্থতার ফলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘ এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এর বিলুপ্তি ঘোষণা করে। তার জায়গায় নূতন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

তবে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাফল্য এবং অবদান উল্লেখযোগ্য। এর সর্বাধিক কৃতিত্ব হল এই যে, এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য সমবায় এবং আন্তর্জাতিক মনোভাব প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠাই প্রমাণ করে যে, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার যে বীজ বপন করেছিল তা জয়যুক্ত হয়েছে।

## অনুশীলনী

**১। সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলন এবং তৎপরবর্তী-কালে ইউরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) কোন্ কোন্ কারণে ইটালিতে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ?

(গ) জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী দল কিভাবে ক্ষমতার অধীশ্বর হয়, সংক্ষেপে লেখ।

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে পৃথিবীর ক'টি দেশ যোগদান করে? মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন কারা?

(খ) ভার্সাই চুক্তি কবে কার কার মধ্যে সংঘটিত হয়? শর্ত অনুযায়ী কোন্ দেশকে কি কি ছাড়তে হয়?

(গ) মুসোলিনী কে ছিলেন? তাঁর নেতৃত্বে কবে কারা কোথাকার শাসন ক্ষমতা দখল করে? তিনি কি উপাধি ধারণ করেছিলেন?

(ঘ) হিটলার কবে কোথায় কোন দল গঠন করেন? বিরোধীরা এই দলকে কী নামে অভিহিত করে? কোন্ কোন্ অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে এই দল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে?

**৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) — খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে — বিনা শর্তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে — — পরিসমাপ্তি ঘটে।

(খ) —, — এবং অস্ট্রিয়া কর্তৃক অধিকৃত — ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহকে নিয়ে নূতন করে আবার — রাজ্য সৃষ্ট হল।

(গ) — ও — দের অগ্রগতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিষ্টরা — নামক এক আধা সামরিক সংস্থা গঠন করল।

**৪। সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর :**

(ক) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী 'ভার্সাই চুক্তি' সম্পাদিত হয়।

(খ) নিউলির সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়ার কিছু অংশ পায় যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রীস।

(গ) ভার্সাই চুক্তির ফলে রুমানিয়া আর গ্রীসকে কিছু এলাকা হারাতে হল।

(ঘ) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

**৫। সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) ক্ষমতা পেয়ে হিটলার হলেন ইল দ্যুচে/ফ্যুরার।

(খ) মুসোলিনী যে দল গঠন করেন, তার নাম ছিল কালো কুর্তা বাহিনী/লাল কুর্তা বাহিনী।

(গ) জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল প্রবক্তা ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন/উইলসন।

(ঘ) প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন অর্লেণ্ডো/ক্লেমেন্সোঁ।

**৬। টীকা লিখ :**

(ক) ভার্সাই চুক্তি (খ) লীগ অব নেশনস্ (গ) কালো কুর্তা বাহিনী।

———

# পঞ্চদশ অধ্যায়
# দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

**কারণ:** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মাত্র দুই দশক পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বিবিধ কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে। ভার্সাই সন্ধির সর্তসমূহ ছিল অত্যন্ত কঠোর। জার্মানরা মনে করত যে, এই অন্যায় সন্ধি তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা এর পরিবর্তন কামনা করেছিল, অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা, ভার্সাই চুক্তি জার্মানদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয়ে থাকে, ভার্সাই চুক্তির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব এবং জার্মানি, জাপান, ইটালি প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী নীতির অনুসরণও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রশস্ত করে। অপর দিকে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশসমূহ যে কোন ভাবে শান্তি বজায় রাখার জন্য স্বৈরতন্ত্রী দেশসমুহের প্রতি প্রথম দিকে যে তোষণ নীতি গ্রহণ করে তা ঐসব দেশের আগ্রাসী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলে শান্তিকে বিঘ্নিত করে। এইসব দেশের সম্প্রসারণশীল নীতির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহ সাম্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের আগ্রাসী নীতির বিরোধিতার জন্য রাশিয়ার বন্ধুত্ব অর্জনের চেষ্টা তো করেই নি উপরন্তু তারা জার্মান, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। তাদের এই অদূরদর্শিতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

যেসব ক্ষেত্রে তার পুঁজিবাদী স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন হতে পারে সেসব ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে নি। তার এই স্বার্থপর-নীতি পরিণামে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার প্রসার, অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা প্রভৃতিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পেছনে এক প্রধান কারণ হল নাৎসী জার্মানির আক্রমণাত্মক নীতি।

**প্রত্যক্ষ কারণ**ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হল ডানজিগ এবং পোলিশ করিডরের দাবিতে জার্মানি কর্তৃক ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ। জার্মানি এই আক্রমণ বন্ধের আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ**ঃ এই যুদ্ধ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জার্মানি এবং তার মিত্র জাপান বিপুল সাফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

**ফলাফল**ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক কালের এক সর্বাত্মক ও সর্ববৃহৎ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে অসংখ্য সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়। ধনসম্পত্তির ক্ষতিও হয় প্রচুর। এই ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কা সামলে উঠতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর যথেষ্ট সময় লাগে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষে থাকলেও বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতার ফলে তাদের অধীনস্থ উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই জাগ্রত জাতীয়তাবাদকে

দমন করার শক্তি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের ছিল না। এর ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার পদানত দেশসমূহের অধিকাংশই আবার স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতিতে দুটি প্রধান শক্তিরূপে আবির্ভূত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া। এই দুই বৃহৎশক্তিকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ক্রমশঃ পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী শিবিরে বিভক্ত হয়। দুই শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। বিশ্বযুদ্ধে আণবিক বোমার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। তাই এর পর পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ে সোভিয়েত রাশিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সোভিয়েত বাহিনী মধ্য ও পূর্ব ইউ-রোপকে নাৎসী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে। সোভিয়েত বাহিনীর এই সাফল্য ঐ এলাকার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণকে যে প্রেরণা জোগায় তার ফলে ঐ অঞ্চলের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনেও মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব সমাজতান্ত্রিক সরকারের উদ্ভব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা আরো গভীরভাবে অনুভূত হয়। তাই বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন :**

(ক) কি কি কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার মাত্র দুই দশক পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়?

(খ) সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম ঘটে, তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ?

(খ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হয় ? কারা পরাজিত হয় ? কি কি ক্ষতি হয় ?

(গ) যুদ্ধোত্তর যুগে কোন্ দুই শক্তিধর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সমগ্র বিশ্ব কোন্ কোন্ শিবিরে বিভক্ত হয় ?

(ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে কোন্ কোন্ দেশ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে ? তাদের উপনিবেশগুলোর মধ্যে যারা স্বাধীন হয়, তেমন কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করতে পার কি ?

৩। **শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) তাই বলা হয়ে থাকে, ভার্সাই—মধ্যেই——বীজ—ছিল।

(খ) ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পর বিশ্বজুড়ে—মন্দা,—জাতীয়তাবাদ এবং—চিন্তা-ধারার প্রসার,—বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা প্রভৃতিও— —জন্য দায়ী।

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে—পরাজয়ে— —অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঘ) বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং— — ও সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়—।

৩। **টীকা লিখ :**

(ক) ভার্সাই চুক্তি (খ) তোষণ নীতি।

———

## ষোড়শ অধ্যায়

# ভারতবর্ষ ( ১৯১৯-১৯৪৭ )

**প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসী যুদ্ধ জয়ের জন্য ইংরাজদের অর্থ এবং সৈন্য দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। তারা আশা করেছিল যে এর বিনিময়ে ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পাবে। এই পটভূমিকায় ইংরাজ সরকার মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার ( ১৯১৯ খ্রীঃ ) ঘোষণা করলে দেখা গেল স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদৌ মেনে নেওয়া হয় নি। এর বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অসন্তোষ বিভিন্ন আন্দোলন এবং সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল। এই বিক্ষোভকে দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার নিপীড়নমূলক কুখ্যাত রাউলাট আইন পাশ করে ( মার্চ, ১৯১৯ )। সরকারী দমন নীতির চরম প্রকাশ ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ( এপ্রিল, ১৯১৯ ) মধ্য দিয়ে। রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে প্রতিবাদের ঝড় উঠল তাকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ( ১৮৬৯ - ১৯৪৮ ) অসহযোগ আন্দোলনের রূপ দিলেন।

**খিলাফৎ আন্দোলন :** মুসলমান জগতের 'খলিফা' বা ধর্মগুরু তখন ছিলেন তুরস্কের সুলতান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগবাটোয়ারা করে নিতে উদ্যত হলে ভারতীয় মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হয়। খলিফার বিরুদ্ধে এই আচরণের প্রতিবাদে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ইংরাজ বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় খিলাফৎ আন্দোলন তাঁর প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মিলিত হয়।

**অসহযোগ আন্দোলন :** খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে এবং

পাঞ্জাবে ইংরাজ সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে ও 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবিতে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার কথা বললেন। গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি :-- পূর্ণ স্বরাজ অর্জন ও খিলাফতীদের দাবি পূরণ। এই উদ্দেশ্যসমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দ্বিবিধ কার্যক্রম গৃহীত হল। এর প্রথমটি হল সরকারের সাথে অসহযোগিতার প্রস্তাব। সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে বৃটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতা করে শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া ছিল অসহযোগ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কার্যক্রমের দ্বিতীয় দিক ছিল গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। এতে বিচারের জন্য সালিশী আদালতের প্রতিষ্ঠা, কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ প্রভৃতির কথা বলা হল। আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীকস্বরূপ চরকায় সূতা কাটা এবং খদ্দর ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হল।



মহাত্মা গান্ধী

অসহযোগের এই আহ্বানে সারা দেশে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিল। বহু লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী তাঁদের ব্যবসা পরিত্যাগ করলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ব্যক্তিরা। এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং এর অন্তর্নিহিত শক্তি ইংরাজ শাসকদের মনে ভীতির উদ্রেক করে। অসহযোগ আন্দোলনকে দমন করার জন্য প্রায় তিরিশ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হল। সরকারের দমন নীতি কিন্তু জনগণের মনোবলকে ক্ষুন্ন করতে পারে নি।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় সর্বময় কর্তৃত্ব দিল গান্ধীজীকে। তার নেতৃত্বে এই আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী এক চরমপত্র দ্বারা তিনি ভাইসরয় লর্ড রীডিংকে জানালেন যে, যদি সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান এবং দমনমূলক আইন প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে গণ আইন অমান্য ও কর বন্ধের আন্দোলন শুরু করা হবে। কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই এক উত্তেজিত জনতা গোরক্ষপুর জেলার চৌরী-চৌরা গ্রামের থানায় অগ্নিসংযোগ করে এবং কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। অহিংসা নীতির এই বিচ্যুতিতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এতে সারা দেশে আশা ভঙ্গের ছায়া নেমে আসে। আন্দোলন বন্ধ করার সাথে সাথেই গান্ধীজী কারারুদ্ধ হন।


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন এক স্মরণীয় অধ্যায়। আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ এই আন্দোলন সারা দেশে বিরাট গণ-জাগরণ ঘটায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে এর অবদান অপরিসীম।

**স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর যোগদান :** ইতিমধ্যে স্বাধীনতার দাবিতেও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকরাও ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। চম্পারণে কৃষকদের ওপর দীর্ঘ-দিন ধরে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চলছিল, এর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কৃষকদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয় এবং নিপীড়নমূলক 'তিনকাটিয়া' ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়, গুজরাটের খয়রা জেলাতেও সরকারী কর নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কৃষকরা জয়যুক্ত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় কৃষকদের মনে খাজনা না দেওয়ার আহ্বান গভীরভাবে দাগ কাটে। মেদিনীপুরের কৃষকেরা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে। এই সময়ে বাংলাদেশে কৃষক-দের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ভিত্তিতে বহুদিন ধরে কৃষক সভা গঠিত হচ্ছিল, এই কৃষক সভাসমূহকে সম্মিলিত করে ভারতব্যাপী এক যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালে 'অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভা' গঠিত হয়। এইভাবে কৃষক আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনও ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়। ঐ বৎসরেই ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সরকার সন্দেহের চোখে দেখছিল। তাই প্রথম থেকেই কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে দমন নীতির প্রয়োগ করা হয়। সরকারের নজর এড়িয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতা গোপনে পরিচালিত হত। প্রকাশ্য কার্যকলাপের জন্য 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস পার্টি' গঠন করে তার মাধ্যমে কম্যুনিষ্টরা শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন। বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে ভীত হয়ে সরকার তা দমনের জন্য বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। বহু প্রখ্যাত শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিচার করা হয়। বিচারে তাঁদের অনেককেই কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়। এই সব নিপীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিক আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

**আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ঃ** অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও নিজেদের ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এক শাসন সংস্কার ঘোষণার দ্বারা ভারতবাসীর অসন্তোষ দূর করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করলেন

( ১৯২৭ খ্রীঃ )। কিন্তু সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এই কমিশন বর্জন করল। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেস এক প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে যে, এক বৎসরের মধ্যে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রদান না করে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করায় ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন অমান্য গৃহীত হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গান্ধীজীর ওপর অর্পিত হল। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস হিসাবে উদযাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর আনুগামীদের সাথে ডাণ্ডি অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করলেন। লবণ আইন অমান্য দেশে এক বিপুল উদ্দীপনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্কুল-কলেজ ও আইন-আদালত বর্জন, শোভাযাত্রা, পিকেটিং ও 'বয়কট' প্রভৃতির মাধ্যমে সারা ভারতে এক বিপুল গণ আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলন বন্ধ করতে অচিরেই সরকারী নিপীড়ন শুরু হয়। গান্ধীজীসহ সমস্ত কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। জুন মাসে কংগ্রেসকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। হাজার হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করল।

**গোল টেবিল বৈঠক :** ইতিমধ্যে ভারতীয় জনমতকে কিছুটা শান্ত করার জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্য লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক আহূত হয়। ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ এতে যোগদান করলেও কংগ্রেস এতে যোগ দেয় নি। কিন্তু কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় বুঝতে পেরে বড়লাট লর্ড আরউইন গান্ধীজীর সাথে আলোচনা শুরু করলেন। দীর্ঘ আলো-

চনার পর তাঁদের মধ্যে যে বোঝাপড়া হয় তা গান্ধী আরউইন চুক্তি (১৯৩১) নামে খ্যাত। এই চুক্তিতে সরকার রাজবন্দীদের মুক্তিদান এবং দমনমূলক বিভিন্ন আইন প্রত্যাহার করতে রাজী হয়। অপর-পক্ষে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রেখে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়। কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু এই বৈঠকও ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হৃদয়ে গান্ধীজী দেশে ফিরলেন।

**আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ** দেশে ফিরে গান্ধীজী দেখলেন যে, সরকারী দমন নীতি অব্যাহত রয়েছে। এই অবস্থায় স্থগিত আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু করা হল। প্রত্যুত্তরে সরকার গান্ধীজীসহ অন্যান্য সমস্ত কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তার করে। কিন্তু কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করেও সরকার আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ দমন করতে পারলেন না। অবশেষে গান্ধীজীর পরামর্শে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিনা শর্তে আইন অমান্য নীতির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্যই গান্ধীজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ এই আন্দোলন ভবিষ্যতে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে।

**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতঃ** ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর সাথে আলোচনা না করেই ভারতবর্ষ জার্মানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলে ঘোষণা করল। এতে ভারতীয় নেতারা ক্ষুব্ধ হয়।

১৯৪০ সাল থেকেই যুদ্ধ ক্রমশ মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যেতে থাকে। ১৯৪২ সালের প্রারম্ভে জাপানের দ্রুত অগ্রগতি এবং সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশের পতনের ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। এই অবস্থায় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মিত্রপক্ষ ভারতের সহযোগিতা কামনা করছিল। বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতা

লাভের উদ্দেশ্যে বৃটিশ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে এক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাসহ ভারতে পাঠায়। কিন্তু ক্রীপসের প্রস্তাব কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হল না। ক্রীপসের দৌত্য ব্যর্থ হল।

ভারত ছাড় প্রস্তাব এবং আগষ্ট অভ্যুত্থান : ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতা দেশে হতাশা এবং ক্ষোভের সৃষ্টি করে। গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় 'ভারত ছাড়' (quit India) প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। ৯ই আগষ্ট প্রত্যুষে গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পূর্বে আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কোন নির্দেশ তারা দিয়ে যেতে পারেনি। কিন্তু গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (করব অথবা মরব) আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী 'ইংরাজ ভারত ছাড়' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে।

সরকারের ধারণা ছিল যে, কংগ্রেসের নেতাদের গ্রেপ্তার করলেই আন্দোলন থেমে যাবে। কিন্তু নেতৃত্বহীন ভারতবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আন্দোলন শুরু করল তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত জনতা থানা দখল করে, রেল লাইন তুলে ফেলে, টেলি-গ্রাফের তার কেটে বৃটিশ শাসন যন্ত্রকে অচল করে ফেলার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড দমন নীতির সম্মুখীন হয়েও সর্বশ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় সে সময় অভূতপূর্ব নির্ভীকতা ও দেশ-প্রেমের পরিচয় দেয়। বাংলাদেশে মেদিনীপুর, উত্তরপ্রদেশে বালিয়া, মহারাষ্ট্রের সাতারা প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল আগষ্ট বিপ্লবীরা বৃটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন সরকার গঠন করে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইংরাজ সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও বহু লোকক্ষয়ের পর ঐসব এলাকায় ইংরাজ অধিকার পুঃনপ্রতিষ্ঠা করতে সামর্থ্য হয়।

অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও আগষ্ট অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। তবে আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই অভ্যুত্থান একেবারে বিফল হয়নি।

এই অভ্যুত্থানের ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিন যে শেষ হয়ে আসছে এবং ভারতকে আর বেশিদিন শৃঙ্খলিত করে রাখা সম্ভব নয় ইংরাজ শাসকরা তা উপলব্ধি করে।

**আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গণমনে তার প্রতিক্রিয়া ঃ** ভারতের অভ্যন্তরে যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন চলছিল তখন ভারতের আর একজন বরেণ্য নেতা বিদেশে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তিনি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বাসগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। এই সময় তিনি পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে প্রথমে কাবুল এবং সেখান থেকে বার্লিনে পৌঁছান। প্রথমে তিনি জার্মানির হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে জার্মানির মাটিতে এক 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন।

ইতিমধ্যে জাপানও মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক বিশাল এলাকা দখল করে। বহু ভারতীয় সৈন্য জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। মোহন সিং প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহায়তায় এই বন্দী সৈন্যদের মধ্য থেকে এক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। ইতিমধ্যে জার্মানি থেকে এক সবমেরিনে দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছান।



সুভাষচন্দ্র বসু

তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে নূতন করে সংগঠিত করেন। সুভাষচন্দ্র হলেন এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক—'নেতাজী'। তিনি তাঁর সৈন্যদের 'চলো দিল্লী' বাণী-দ্বারা চরম আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করলেন। আজাদ হিন্দ বাহিনী বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের দ্বারদেশে উপনীত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে শুরু

করেছিল। প্রয়োজন রসদ সমরোপকরণ না পাওয়ায় অশেষ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও অবশেষে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পশ্চাদ-পসরণ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত জাপান পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। খুব সম্ভবতঃ এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীও মারা যান।

যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনী পরাজিত হলেও এই বাহিনীর কীর্তি সারা ভারত জুড়ে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই বিচারের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা দেয়, এতে ভীত হয়ে সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি দেয়।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যক্রম ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকেও দেশপ্রেমের উদ্বুত করে। এতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় তার ফলে ১৯৪৬ খ্রীঃ এক নৌ বিদ্রোহ ঘটে। ইংরাজরা বুঝতে পারে যে, ভারতীয় বাহিনীর ওপর আর নির্ভর করা চলবে না। লর্ড এট্‌লী পরবর্তীকালে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় সৈন্যদের আনুগত্যের ওপর আর নির্ভর করা চলবে না। এই উপলব্ধির ফলেই ইংরাজরা ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান অপরিসীম।

**ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঃ** ভারতবর্ষকে যে আর বেশীদিন পদানত করে রাখা চলবে না, নৌ-বিদ্রোহ তা সুস্পষ্ট করে দেয়। তাই নৌ-বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পরদিনই (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লী ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ভারতে যাবেন। এই মন্ত্রীমিশন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সম্প্রদায়সমূহের সাথে আলোচনা করে এক সংবিধান সভা গঠন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন।

মন্ত্রীমিশন দেড় মাসের ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংস্থা এবং

সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এক পরিকল্পনা পেশ করল। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবসমূহ কোন প্রধান রাজনৈতিক দলই খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তবে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব কংগ্রেসকে আকৃষ্ট করে। অপরদিকে গ্রুপিং প্রথার মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি কার্যত মেনে নেওয়ায় মুসলিম লীগ আনন্দিত হয় এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল সংবিধান সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হয়।

প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে মুসলিম লীগ প্রস্তাবিত অন্তবর্তী সরকারে যোগদান করে। কিন্তু প্রধান দেশগুলো কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এই সময় দেশের বিভিন্ন অংশে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীঃ জুন মাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। এতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি কার্যত মেনে নেওয়া হয়। বৃটিশ পার্লামেন্ট অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতেও সম্মত হয়।



মাউন্টব্যাটেন

কংগ্রেস বরাবরই ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নেয়। লীগ ও মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরপর ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ করে। স্বাধীনতা আইন পাশ হওয়ার পর ভারত পাকিস্তান এই দুটি ডোমিনিয়নের

সৃষ্টি হয়। এই দুটি ডোমিনিয়নের গণপরিষদ স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ শাসনতন্ত্র গঠন করার ক্ষমতা পায়।

১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে ভারত দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসরের পরাধীনতার পর পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্ম-প্রকাশ করল। দেশ ও দেশবাসীর সেবা ও মানবকল্যাণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে স্বাধীন ভারত যাত্রা শুরু করল।

## অনুশীলনী

### ১। সাধারণ প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী কি ছিল? এই আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আন্দোলন প্রত্যাহারের কারণ লেখ।

(খ) আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(গ) ভারত ছাড় আন্দোলন কখন কিভাবে গড়ে ওঠে? এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া কি?

(ঘ) আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা, ইহার সফলতা ও বিফলতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(ঙ) ভারতের স্বাধীনতা লাভের নেপথ্য ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

### ২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দেন? জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কি জান?

(খ) অসহযোগ আন্দোলনের দুটি উদ্দেশ্য কি কি ছিল? অসহযোগ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

(গ) কাকে কেন্দ্র করে কার বিরুদ্ধে খিলাফৎ আন্দোলন গড়ে ওঠে? এর উৎস কি?

(ঘ) কী উদ্দেশ্যে কবে 'অল ইণ্ডিয়া কৃষকসভা' গঠিত হয়? 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস্ পার্টি' কি জন্য গঠিত হয়?

(ঙ) গোল টেবিল বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? কে এতে যোগ দেন? এর ফলাফল কী?

### ৩। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ

(ক) প্রথম গোলটেবিল বৈঠক গান্ধী আরউইন চুক্তি নামে খ্যাত।

(খ) ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুলাই 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(গ) ১৯৪১ সালে অন্তরীণ নেতাজী দেশত্যাগ করে বার্লিনে গিয়ে পৌছান।

(ঘ) ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ করে।

৪। **সঠিক উত্তরটি বেছে দাও :**

(ক) ভারত বিভাগের পরিকল্পনা করে কংগ্রেস ও মাউন্টব্যাটেন/লীগ ও মাউন্টব্যাটেন।

(খ) নৌ-বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে/১৯৪৬ সালে।

(গ) গান্ধীজীর পরামর্শে ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই গৃহীত হয় অসহযোগ আন্দোলন/ভারত ছাড় প্রস্তাব।

(ঘ) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে/১৯৪৮ সালে।

৫। **টীকা লিখ :**

(ক) চৌরীচৌরার ঘটনা (খ) গোলটেবিল বৈঠক (গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (ঘ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র (ঙ) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

## সপ্তদশ অধ্যায়

# চীনের বিপ্লব ( ১৯১১-১৯৪৯ )

**ইউ-য়ান্-সিকাই ও সান্-ইয়াৎ-সেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব :** ১৯১১ সালের বিপ্লবের ফলে মাঞ্চু বংশের পতন ঘটলেও চীনাবাসীদের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তৃপ্ত হয় নি। ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই ইউ-য়ান্ জনগণের স্বার্থরক্ষার প্রতি নজর না দিয়ে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সান্-ইয়াৎ-সেন তাঁর এই স্বৈরাচারী নীতির বিরোধীতা করলে চীনে আবার অন্তর্কলহ দেখা দিল এবং নবগঠিত প্রজাতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন হল। ইউ-য়ানের সাথে দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে ডঃ সান্ আবার দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইউ-য়ানের লক্ষ্য ছিল প্রজাতন্ত্র ভেঙে দিয়ে নিজেকে চীনের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে ইউ-য়ান তাঁর অনুগামীদের সহায়তায় এক সাজানো গণভোটের মাধ্যমে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নে দেশবাসীর সম্মতি আদায় করেন। কিন্তু তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করলে সারা দেশে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এতে ভীত হয়ে তিনি রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ত্যাগ করেন। এর অল্পদিনের মধ্যেই ইউ-য়ান্ ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন (১৯১৬)।

**কুয়োমিন্ তাঙ্ :** ১৯১১ সালের বিপ্লবের সাফল্যের পর পূর্বেকার গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থাসমূহকে নিয়ে ডঃ সান্ কুয়োমিন্ তাঙ্ নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নবগঠিত কুয়োমিন্ তাঙ্ ইউ-য়ান্-সিকাইয়ের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত না হলেও কুয়োমিন্ তাঙ্ দল চীনে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রসারের পক্ষে সহায়ক হয়।

**তু-চুন-দের কবলে চীন :** ইউ-য়ানের মৃত্যুর পর বিভিন্ন প্রদেশের শাসক সেনানায়করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে কার্যত স্বাধীন হয়ে বসে। তু-চুন নামে অভিহিত এই সময় নেতারা নিজ নিজ এলাকায় যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতে থাকে। নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তারা পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করতেও দ্বিধা করত না। এই ভাবে চীনে আবার চরম অরাজকতা দেখা দিল। সাধারণ লোকদের দুঃখকষ্টের আর অবধি থাকল না।

**৪ঠা মে-র আন্দোলন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চীন প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার পায়। চীনারা আশা করেছিল যে, প্যারিস সম্মেলনে তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। ফলে জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ চীনা ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত নিরাশ হয়। তাদের এই হতাশা ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এই আন্দোলনে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা

নেতৃত্ব দেয়। বণিক এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ৪ঠা মের আন্দোলন কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের পুনর্গঠন এবং চীনে এক কম্যুনিষ্ট দল সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে। এই আন্দোলন এক শক্তিশালী নূতন চীন গঠনের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে।

**সান্-ইয়াৎ-সেন এবং তাঁর তিনটি মৌলিক নীতি :** ইউ-য়ান্-সিকাইয়ের মৃত্যুর পর দক্ষিণ চীনে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাণ্টন ছিল এর রাজধানী। ১৯২১ সালে সান্-ইয়াৎ-সেন ক্যাণ্টন সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি উত্তর চীনের সমর নায়কদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমগ্র চীনকে আবার এক অখণ্ড রাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ডঃ সান্ তাঁর কর্মজীবনে চীনের সর্বাত্মক উন্নতির জন্য কয়েকটি নীতির প্রচার করেন। এগুলি 'স্যন্-মিন্ চু আই' বা 'তিনটি গণনীতি ( Three Peoples Principles ) নামে পরিচিত। এই তিনটি নীতি হল : (১) সর্বসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত এবং সর্ব-সাধারণের কল্যাণের জন্য শাসন পরিচালন ( বা গণতন্ত্র ) ; (২) সর্ব সাধারণের জীবন ধারণের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ( বা সমাজতন্ত্র ) ; এবং (৩) বিদেশী নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি ( বা গণতন্ত্র )। এই ভাবে দেখা যায় যে, সান্-ইয়াৎ-সেন মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ না করলেও চীনের অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে এক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টাকে সফল করার জন্য অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় ডঃ সান পিকিংয়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ডঃ সান দলমত-নির্বিশেষে চীনের সমস্ত অধিবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জনে সমর্থ হন। তাঁকে আধুনিক চীনের জনক বলে অভিহিত করা হয়।

**চিয়াং কাইশেকের দমনমূলক নীতি :** সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের নেতৃত্ব নিয়ে কিছুকাল বিবাদ চলে। তারপর চিয়াং কাইশেক ঐ দলের অবিসংবাদী নেতারূপে স্বীকৃত

হন। চিয়াং সমগ্র চীনকে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমর-নায়কদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়। চিয়াংয়ের বাহিনী প্রথমে হ্যাংকাউ ও পরে পিকিং দখল করে।



চিয়াং কাইশেক

সমর-নায়কদের বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করলেও চিয়াং প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করায় কম্যুনিষ্ট এবং কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের বামপন্থী গোষ্ঠীর সাথে তাঁর তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। বামপন্থীদের উচ্ছেদের জন্য দমনমূলক নীতি গ্রহণ করলে কম্যুনিষ্টদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্টরা মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কিয়াংসি প্রদেশে তাদের শক্তি সংহত করছিল। চু-তের সহায়তায় সেখানে এক লালফৌজ সংগঠিত হয়। চিয়াং কাইশেকের কার্যকলাপের ফলে করভার পীড়িত কৃষক ও প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল। তাদের এই মনোভাব সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা কম্যুনিজম প্রসারের পক্ষে সহায়ক হয়।

**লঙ মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা:** কিয়াংসি প্রদেশে অবস্থিত কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে চিয়াং কর্তৃক প্রেরিত প্রথম কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। তারা বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে কিয়াংসি প্রদেশের ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। কম্যুনিষ্টরা তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে দুর্গম এলাকার মধ্য দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। শুরু হল তাদের দীর্ঘ পদযাত্রা। উত্তর পশ্চিম চীনে কম্যুনিষ্টদের ছয় হাজার মাইলের এই 'দীর্ঘ পদযাত্রা' ইতিহাসের এক বিস্ময়কর কাহিনী। কুয়োমিন্

তাঙ্ বাহিনীর আক্রমণ এড়াবার জন্য অনেক পাহাড় পর্বত জলপ্রপাত উপত্যকা, অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে এই অসংখ্য মানুষের পদযাত্রা চলল দীর্ঘকাল ধরে। পথের কষ্টে এবং কুয়োমিন্ তাঙ্ বাহিনীর আক্রমণে পথের ধারে বহুলোক প্রাণ হারাল। প্রায় একলক্ষ লোক শুরু করেছিল এই পদযাত্রা।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মেন্সি প্রদেশে যখন তাঁরা ঘাঁটি স্থাপন করল তখন তাদের মধ্যে বেঁচেছিল মাত্র হাজার কুড়ি লোক। কিন্তু এই নিদারুণ পরিশ্রম ও কায়িক ক্লেশ সহ্যের শিক্ষা, মানুষের ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ পরবর্তীকালে তাদের সাফল্যের পক্ষে সহায়ক হয়।

**সিয়াং ফু ঘটনা :** ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। এরপর ক্রমশঃ তারা চীনের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে অগ্রসর হয়। জাপানী সৈন্যরা যখন চীনের ওপর এই হামলা চালাচ্ছিল তখন চিয়াং কম্যুনিষ্টদের সাথে গৃহযুদ্ধে রত ছিলেন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য চিয়াং যখন সিয়াং ফুতে উপস্থিত হন তখন তাঁর নিজের সৈন্যরাই তাঁকে বন্দী করে কম্যুনিষ্টদের সাথে মিলিতভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাতে বলে। অবশেষে চিয়াং কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রত্যাহার করে তাদের সাথে মিলিতভাবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করলেন।

**জাপানী আক্রমণের বিস্তৃতি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ :** ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণ সম্প্রসারিত হল। কিছুদিনের মধ্যে জাপানীরা চীনের এক বিস্তৃত এলাকা দখল করল। চীন কিন্তু প্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে বিরত হল না। ইতিমধ্যে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে চীনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক রণাঙ্গনে পরিণত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজয় বরণ করলে সে চীন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

**চীনে কম্যুনিষ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা :** জাপানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর চীনের ওপর কর্তৃত্বের প্রশ্নে আবার কুয়োমিন্ তাঙ্ এবং কম্যুনিষ্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। ইতিমধ্যে অপশাসন ও দুর্নীতির জন্য কুয়োমিন্ তাঙ্ দল গণসমর্থন হারিয়ে ফেলেছিল। গৃহযুদ্ধে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। তারপর তারা চীনের মূল ভূখণ্ড ত্যাগ করে তাইওয়ান বা ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নেয়।

কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের পরাজয়ের পর মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্টরা সমগ্র চীনের ওপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর 'চীন জনগণের প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়। মাও হলেন এই প্রজাতন্ত্রের প্রধান বা চেয়ারম্যান।



হো-চি-মিন



মাও-সে-তুং

তাঁর নেতৃত্বে চীন অল্পদিনের মধ্যে এক শক্তিশালী গণ-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

**১৯৪৫ সালের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিপ্লব ; ইন্দোচীন :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফ্রান্সের পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে জাপান ফরাসী উপনিবেশ ইন্দোচীনের ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্টিত করে। যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর ইন্দোচীনের আন্নাম অঞ্চলে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামীরা স্বাধীনতার দাবি জানালে ফ্রান্সের সাথে

তাদের সংঘর্ষ বাধে। এই ঔপনিবেশিক যুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে সাহায্য করলেও দিয়েন ফুর যুদ্ধে (১৯৫৪) ফরাসী বাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

অতঃপর ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানের জন্য জেনেভাতে এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা বসে। ১৭° ডিগ্রী অক্ষাংশের উত্তরে উত্তর ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে মেনে নেওয়া হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে সম্রাট বাও দাইয়ের নেতৃত্বে ফরাসী নিয়ন্ত্রিত এক পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক হয় যে, পরে ভোটের মাধ্যমে সংযুক্ত উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। লাওস এবং কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। ঐ অঞ্চলগুলিকে নিরপেক্ষ এলাকা বলেও ঘোষণা করা হয়।

নিরপেক্ষ ভোট হলে সমগ্র ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের অনুগামী ভিয়েতনামীরা জয়ী হবে বুঝতে পেরে আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট বাও দাই ভোট গ্রহণের প্রস্তাব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, এর ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতার দাবিতে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সেখানে লক্ষ্য লক্ষ্য আমেরিকান সৈন্য পাঠানো হয়। অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করলেও শেষ পর্যন্ত আমেরিকান সৈন্যরা ভিয়েতনামীদের স্বাধীনতার অদম্য ইচ্ছাকে দমন করতে না পেরে সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। এর পর মিলিত উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক স্বাধীন গণ প্রজাতন্ত্রী ভিয়েতনাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। এইভাবে ইন্দোচীন থেকে বিদেশী আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

ব্রহ্মদেশ : উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা ইংরাজদের পরাজিত করে ব্রহ্মদেশ অধিকার করে। যুদ্ধ চলাকালীনই জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন গোষ্ঠী এ্যান্টি-

ফ্যাসিস্ট পিপ্‌লস ফ্রীডম লীগ গঠনের দ্বারা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করে।

জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটেন ব্রহ্মদেশ তাদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। কিন্তু বৃটিশ সরকার শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে, ব্রহ্মবাসীর স্বাধীনতার অদম্য বাসনাকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অবশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি বৃটেন ব্রহ্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ব্রহ্মে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ব্রহ্ম কমনওয়েলথের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে।

**মালয়েশিয়া** : উনবিংশ শতাব্দীতে মালয়ের ওপর বৃটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসনের সময়ে মালয়ে বহু রবারের বাগান স্থাপিত হয়। ঐ সব চা বাগানে কাজ করার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য বহু ভারতীয় ও চীনা মালয়ে আসে। কিছু সংখ্যক ইউরোপীয়ও মালয়ে বাস করতে থাকে। এইভাবে মালয় এক বহুজাতি অধ্যুষিত দেশে পরিণত হয়। এর ফলে মালয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের পথে প্রথম দিকে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মালয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার সূচনা ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জাপান মালয় অধিকার করে সেখানকার মালয়ী এবং ভারতীয়দের কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়। এতে মালয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও শক্তিশালী হয়। জাপানের পরাজয়ের পর মালয়বাসী স্বাধীনতার দাবিতে ক্রমশঃ সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। সেখানে এক শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট আন্দোলনও শুরু হয়। এই আন্দোলন অবশ্য সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেনি। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইংরাজরা মালয়ের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। মালয় স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

**ইন্দোনেশিয়া** : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তারা খনিজ

সম্পদ সমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়াকে শোষণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। সেখানে যাতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসার না ঘটে সে চেষ্টাও তারা করেছিল। কিন্তু তাহলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইন্দোনেশিয়াতে জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বহু অঞ্চলের মত ইন্দোনেশিয়াও জাপানীরা দখল করে। আত্মসমর্পণ করার ছয় সপ্তাহ আগে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় আবার তাদের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশিয়ানরা তাতে বাধা দেয়। ইন্দোনেশিয়ানরা প্রথম দিকে ওলন্দাজদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলেও তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। বিশ্বের সব ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী দেশ এই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সমর্থন জানায়। তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এ সম্পর্কে বিশ্ব জনমত গঠনের ব্যাপারে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। অবশেষে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর ইন্দোনেশিয়া ঔপনিবেশিকতার বিরোধী আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। ওখানেই ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আফ্রিকা এবং এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিনিধিরা বিখ্যাত বান্দুং সম্মেলনে মিলিত হয়।

**দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বহু প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী দেশ পরাজিত হয়। ঐ সময়ে পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদের দ্রুত প্রসার ঘটে। ভারত, মিশর, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশ তাদের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতির জন্য দাবি জানায়। ঐ দাবি মেনে না নেওয়ায় ঐ সব দেশের অসন্তুষ্ট জনগণ নানা ধরণের আন্দোলন শুরু করে। মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহ বুঝতে পারে যে, তাদের ন্যায্য দাবি মানা হবে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি না দিলে

স্বাধীনতাকামী অগণিত জনগণের অসন্তোষকে দূর করা যাবে না। তাই বৃটেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আতলান্তিক সনদে মানুষের বিভিন্ন অধিকারকে স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দেয়।

**আতলান্তিক সনদ**ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আতলান্তিক মহাসাগরে প্রিন্স অফ ওয়েলস নামক একটি জাহাজে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মিলিত হয়ে আতলান্তিক সনদ নামে এক সনদ রচনা করেন। এই সনদে সম্প্রসারণ নীতি ত্যাগ, পরাধীন জাতির স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার স্বীকার, সরকার নির্বাচনে জনগণের অধিকারকে মর্যাদা দান এবং এক সুন্দর যুদ্ধোত্তর বিশ্ব গঠন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান হল। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ২৬টি দেশের প্রতি-নিধিরা ওয়াশিংটন শহরে মিলিত হয়ে এই সনদের ঘোষণা বাণীতে স্বাক্ষর করে।

**সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা**ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটার পর ভবিষ্যৎ যুদ্ধ নিবারণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে উপস্থিত পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ রচনা করে। এই সনদের ভিত্তিতে ২৪শে অক্টোবর (১৯৫৪ খ্রীঃ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিনটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা দিবস রূপে স্বীকৃত।

**সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য**ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে উহার উদ্দেশ্যসমূহ স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এর চারটি প্রধান উদ্দেশ্য হল নিম্নরূপঃ— (১) যৌথ ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা। (২) সমান অধিকার এবং

জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে সকল দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন' (৩) আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সমস্যার সমাধান এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রসার, ও (৪) মানুষের মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা। এই আদর্শগুলিকে বাস্তবায়িত করাই হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য।

**সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী জার্মানির পরাজয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। সোভিয়েত রাশিয়ার এই সাফল্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধি করে। যুদ্ধের পর মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বহু দেশে সমাজ-তান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

**সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের বিস্তার:** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত বিকাশ ঘটে। রাশিয়া এবং চীন দুটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপ, এশিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে আরও অনেকগুলি দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একে একে উপনিবেশসমূহ স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বোযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানুষ বিদেশী শাসন ও সর্বপ্রকার শোষণ মুক্ত এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছে আশা করা যায় তা জয়যুক্ত হবে।

## অনুশীলনী

১। **সাধারণ প্রশ্ন:**

(ক) চীনে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসারের যে আন্দোলন ডঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(খ) চিয়াং কাইশেকের দমন নীতি ও বিখ্যাত লঙ্ মার্চ-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(গ) চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার কাহিনী আলোচনা কর।

(ঘ) ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লেখ।

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর।

**২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

(ক) সান্-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে ইউ-য়ান-সিকাই-এর দ্বন্দ্ব বেধেছিল কেন? ইউ-য়ান-এর মূল লক্ষ্য কী ছিল?

(খ) কুয়োমিনতাঙ্-দলের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই দল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল?

(গ) সান-ইয়াৎ-সেন-এর তিনটি মৌলিক নীতি কি কি ছিল?

(ঘ) মাও- সে-তুঙ কে ছিলেন? চীন জনগণের প্রজাতন্ত্র কবে কার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ঙ) হো-চি-মিন কে ছিলেন? তাঁর নেতৃত্বে ইন্দোচীন থেকে বিদেশী আধিপত্য কিভাবে বিলুপ্ত হয়?

(চ) বান্দুং সম্মেলন কোথায় হয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ার ওপর কাদের প্রভূত্ব ছিল? কিভাবে তাদের উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়?

**৩। সঠিক উত্তরটির পাশে দাগ দাও :**

(ক) জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ সান ফ্রান্সিসকোয়/জেনেভায় সম্মেলন হয়।

(খ) উনবিংশ শতাব্দীতে মালয়ের ওপর বৃটিশ/ওলন্দাজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ইন্দোনেশিয়/ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয়।

(ঘ) ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজয় স্বীকার করলে চীন/মালয়েশিয়া থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

**৪। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :**

(ক) ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত——এবং এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিনিধিরা বিখ্যাত——সম্মেলনে মিলিত হয়।

(খ) যুদ্ধে—— পরাজয়ের পর ইন্দোচীনের —— অঞ্চলে —— নেতৃত্বে ——স্বাধীনতার দাবি জানালে ফ্রান্সের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে।

(গ) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে —— বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য —— যখন —— উপস্থিত হন তখন তাঁর নিজের —— তাঁকে বন্দী করে —— সাথে মিলিতভাবে——বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাতে বলে।

৫। **টীকা লিখ :**

(ক) ৪ঠা মে'র আন্দোলন (খ) আতলান্তিক সনদ (গ) লঙ মার্চ

---

# * কালপঞ্জী *

## ইউরোপের নবজাগরণ

| খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা | খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা |
|---|---|---|---|
| ১২৬৫-১৩২১ | দান্তে | ১৪৭৫-১৫৬৪ | মাইকেল এঞ্জেলো |
| ১৩০৪-১৩৭৪ | পেত্রাক | ১৪৮৩-১৫২০ | রাফায়েল |
| ১৩১৩-১৩৭৫ | বোকাচিও | ১৫৬১-১৬২৬ | ফ্রন্সিস্ বেকন |
| ১৫৫২-১৫৯৯ | স্পেন্সার | ১৪৭৩-১৫৪৩ | কোপারনিকাস |
| ১৫৬৪-১৬১৬ | শেক্স্পীয়ার | ১৫৬৪-১৬৪২ | গ্যালিলিও |
| ১৪৫২-১৫১৯ | দা-ভিঞ্চি | ১৩৯৮-১৪৬৮ | গুটেনবার্গ |

## ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩৯৪-১৪৬০ | রাজকুমার হেনরী | | |
| ১৪৮৬ | দিয়াজের উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ | | |
| ১৪৯২ | কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার | | |
| ১৪৯৭-৯৮ | ভাস্কো-দা-গামার ভারতে যাবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার | | |
| ১৫১৯ | স্পেনের মেক্সিকো দখল | ১৫৩২ | স্পেনের পেরু অধিকার |
| ১৫১৯-২১ | ম্যাগলানের ভূ-প্রদক্ষিণ | ১৫৭৭-৮০ | ড্রেকের ভূ-প্রদক্ষিণ |

## ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩২০-১৩৮৪ | জন ওয়াইক্লিফ | ১৫৪৫-৬৩ | ট্রেন্টের অধিবেশন |
| ১৩৩১-১৪০১ | স্টিটনের টমাস | ১৫২০-১৫৫৮ | পঞ্চম চার্লস |
| ১৫১৭ | লুথারের আন্দোলন | ১৫২৭-১৫৯৮ | দ্বিতীয় ফিলিপ |
| ১৫২৯ | ডায়েট অফ স্পায়ার্স | ১৫৫৮-১৬০৩ | রানী এলিজাবেথ (১ম) |
| ১৫০৯-৬৪ | জন ক্যালভিন | | |

## সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব

| | |
|---|---|
| ১৬০০ | ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন |
| ১৬০৩ | প্রথম জেমসের রাজ্যলাভ |
| ১৬০৪ | কালিকটের জামোরিণের সঙ্গে ওলন্দাজের চুক্তি |

| খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা | খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা |
|---|---|---|---|
| ১৬১৫ | জাহাঙ্গীরের রাজসভায় ইংরেজ দূত টমাস রোর আগমন ও এদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভ | | |
| ১৬২৮ | অধিকারের আবেদন | | |
| ১৬৩৩ | আহমদনগরের মুঘল সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি | | |
| ১৬৩৬ | বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে সন্ধি | | |
| ১৬৪৯ | প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড | ১৬৬০ | দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যলাভ |
| ১৬৪৯-৫৮ | ক্রমওয়েলের শাসন | ১৬৮৮ | গৌরবময় বিপ্লব |

## ভারতবর্ষ

| খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা | খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা |
|---|---|---|---|
| ১৫২৬ | পানিপথের প্রথম যুদ্ধ | | |
| ১৫৩০ | বাবরের মৃত্যু ও হুমায়ুনের রাজ্যলাভ | | |
| ১৫৪০ | শেরশাহের নিকট হুমায়ুনের পরাজয় ও পলায়ন | | |
| ১৫৫৫ | হুমায়ুনের পুনরায় দিল্লী অধিকার | | |
| ১৫৫৬ | পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ | | |
| ১৫৫৬-১৬০৫ | আকবরের রাজত্বকাল | ১৬৭৪ | শিবাজীর রাজ্যাভিষেক |
| ১৬০০ | ইস্ট-ইণ্ডিয়া | ১৬৯৬ | ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠা |
| ১৬০৫-১৬২৭ | জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল | ১৬৭৫-১৭০৮ | গুরু গোবিন্দ সিংহ |
| ১৬২৮-১৬৫৮ | শাহজাহানের রাজত্বকাল | ১৭৩৯ | নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠন |
| ১৬৬০-১৭০৭ | ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল | ১৬৬৮ | শিবাজীর সঙ্গে মুঘলদের সন্ধি |
| ১৭৫১, ১৭৫৬, ১৭৬৪ | কর্ণাট যুদ্ধ | ১৭৬৯ | পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ |

## ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

| খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা | খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা |
|---|---|---|---|
| ১৭৪৩-৪৮ | প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ | ১৭৬৭-৬৯ | প্রথম মহীশূর যুদ্ধ |
| ১৭৫৭ | পলাশীর যুদ্ধ | ১৭৭৫-৮২ | প্রথম মারাঠা যুদ্ধ |
| ১৭৬৪ | বক্সারের যুদ্ধ | ১৮৪৫-৪৬ | প্রথম শিখ যুদ্ধ |
| ১৭৬৫ | কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ | ১৮৫৭ | সিপাহী বিদ্রোহ |

## অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ( যুক্তিবাদের যুগ )

| খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা |
|---|---|
| ১৭৬৫ | স্ট্যাম্প আইন |
| ১৭৭৫ | আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত |
| ১৭৭৬ | উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা |
| ১৭৯৯ | নেপোলিয়নের ক্ষমতালাভ |

## ১৮১৫ সাল হইতে ইউরোপের ইতিহাস

| খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা |
|---|---|
| ১৮৬০ | গ্যারিবল্ডীর নেপলসে অবতরণ |
| ১৮৬১ | আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সূচনা |
| ১৮৭০ | ফ্রান্স ও প্রশিয়ার যুদ্ধ, ইটালী কর্তৃক রোম অধিকার |
| ১৮৭১ | ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা |

| খ্রীষ্টাব্দ | ঘটনা |
|---|---|

### ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ

| | |
|---|---|
| ১৮৫১-৬৪ | তাই শিং বিদ্রোহ |
| ১৮৫৮ | তিয়েন সানের সন্ধি |
| ১৮৬০ | দ্বিতীয় ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের সমাপ্তি |
| ১৮৯৪ | চীন-জাপান যুদ্ধ |
| ১৯০০ | বক্সার বিদ্রোহ |
| ১৯০৪-০৫ | রুশ-জাপান যুদ্ধ |

### বৃটিশ রাজ্যের অধীনে ভারত ( ১৮৪৮-১৯১৪ )

| | |
|---|---|
| ১৮৮৫ | জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা |
| ১৯০৫ | বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা |
| ১৯৯৫ | বুড়িলামের যুদ্ধ |

### প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

| | |
|---|---|
| ১৯৪১,২৮শে জুলাই | প্রথম বিশ্বযুদ্ধারম্ভ |
| ১৯১৬,২৮শে এপ্রিল | হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠা |
| ১৯১৯,১৩ই এপ্রিল | জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড |
| ১৯১৯,২৮শে জুন | ভার্সাই সন্ধি |

### রুশ বিপ্লব

| | |
|---|---|
| ১৯০৫ | জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ |
| ১৯১৭,১৫ই মার্চ | জার নিকোলাসের সিংহাসন ত্যাগ |

### ভারতবর্ষ ( ১৯১৯-১৯৪৭ )

| | |
|---|---|
| ১৯১৯ | মণ্টফোর্ড সংস্কার |
| ১৯২০ | অসহযোগ আন্দোলন |
| ১৯৩০ | আইন অমান্য |
| ১৯৪২ | ভারত ছাড় আন্দোলন |
| ১৯৪৪ | ভারতে আজাদ হিন্দ ফৌজ |
| ১৯৪৭,১৫ ই আগষ্ট | ভারতের স্বাধীনতা লাভ |

### চীনের বিপ্লব

| | |
|---|---|
| ১৯৩৬ | ভারত থেকে ব্রহ্মদেশের পৃথকীকরণ |
| ১৯৩৭ | চীন-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাত |
| ১৯৩৯-৪৫ | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ |
| ১৯৫৭ | মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা। |

———

# ইতিহাসের কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন-উত্তর

## প্রথম অধ্যায় ॥ আধুনিক যুগ

১। মধ্যযুগে কোন কোন ক্ষেত্রে সামন্ত প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল?
রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক।

২। কোন শতাব্দীতে ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল?
দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে।

৩। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে কৃষির ক্ষেত্রে কি প্রবর্তিত হয়েছিল?
কৃষি জমিতে নিবিড় চাষের পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

৪। কোন শতাব্দীতে শিল্পের প্রসার ঘটে?
একাদশ হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

৫। কোন শতাব্দীতে প্লেগ রোগ মহামারী হয়েছিল?
চতুর্দশ শতাব্দীতে।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ইউরোপের নবজাগরণ

১। রেনেসাঁ বা নবজাগরণ কথার অর্থ কি? পুনুরুজ্জীবন।

২। নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি!
গ্রীক ও রোমক জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিবাদের প্রসার প্রভৃতি।

৩। নবজাগরণ প্রথম কোথায় শুরু হয়? ইতালিতে।

৪। দান্তে যে মহাকাব্য লিখেছিলেন তার নাম কি?
ডিভাইন কমেডি।

৫। পেত্রার্ক কে ছিলেন?
একাধারে কবি ও মানবতাবাদী এবং প্রকৃতপক্ষে নবজাগরণের চিন্তাধারাপুষ্ঠ ব্যক্তি।

৬। বোকাচিও-র রচিত গ্রন্থের নাম কি?
ডেকামিরন বা দশ রাত্রি।

৭।মেকিয়াভেল্লীর রচিত গ্রন্থের নাম কি?—প্রিন্স।

৮। চসার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কি? ক্যাণ্টারবেরী টেইলস।

৯। ফ্রান্সের উপন্যাসিক কে?—রাবেল।

১০। স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক কে?—সারভান্তিস্।

১১। তিনি কি উপন্যাস রচনা করেন?—ডন কুইক্‌মোট।

১২। মার্টিন লুথারের পথপ্রদর্শক কাকে বলে?—ইরাসমাসকে।

১৩। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির অাঁকা বিখ্যাত ছবির নাম কি?
মোনালিসা ও শেষ ভোজন।

১৪। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কে নবজাগরণ এনেছিলেন?
রজার বেকন।

১৫। তিনি কি কি আবিষ্কার করেন?
চশমার ও দূরবীনের কাচ ও বিবর্ধক কাচ ও বারুদ।

১৬। কোপারনিকাসে কে ও তাঁর সিদ্ধান্ত কি?
পোল্যাণ্ডের এক পণ্ডিত এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।

১৭। গ্যালিলিও কত সালে কি আবিষ্কার করেন?
১৬০৯ সালে এক শক্তিশালী দূরবীন।

১৮। ইউরোপে কে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করেন?
জার্মানীর জন গুটেনবার্গ।

## তৃতীয় অধ্যায় ॥ ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার

১। পর্তুগালের একজন আবিষ্কর্তার নাম কি?
নাবিক হেনরী।

২। ঝটিকা অন্তরীপ কোথায়?—সর্ব-দক্ষিণ দিকে।

৩। উত্তমাশা অন্তরীপ কাকে বলে?—ঝটিকা অন্তরীপকে।

৪। পর্তুগালের রাজধানীর নাম কি?—লিসবন।

৫। আলবুকার্ক কত খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজদের গভর্নর হন?
১৫০৯ খ্রীঃ।

৬। দক্ষিণ আমেরিকা কে আবিষ্কার করেন?
আমেরিগো ভেস্‌পুচি।

৭। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কে কত খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন ?
সুবিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক, ১৫১৯ খ্রীঃ।

৮। নূতন পথ ও দেশের আবিষ্কারের ফলে কিসের সুবিধা হয়েছিল ?
বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৯। কে আমেরিকা আবিষ্কার করেন ?—কলম্বাস।

## চতুর্থ অধ্যায় ॥ ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন

১। ধর্ম-সংস্কার কাকে বলে ?
ধর্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনকে ধর্ম আন্দোলন বলে।

২। কে বাইবেলের অনুবাদ ল্যাটিন ভাষা থেকে ইংরেজীতে করেন ?
জন ওয়াইক্লিফ্।

৩। হাস কে ?—প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক।

৪। জার্মানীর ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান নেতা কে ?
মার্টিন লুথার।

৫। টটজেল কে ?—এক ধর্মযাজক।

৬। রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে কি ধর্মমতের আবির্ভাব হয়েছিল ?
প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমত।

৭। ধর্মসংঘ সংগঠনের নাম কি ছিল ?—জেসুইট সোসাইটি।

৮। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—লোয়েলা।

৯। জেসুইট্‌দের প্রচারক কে ?—ফ্রান্সিস জেভিয়ার।

১০। অগসবার্গ সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?—১৫৫৫ খ্রীঃ।

১১। ফিলিপের শাসনকালে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ কি ?
নেদারল্যাণ্ড বিদ্রোহ।

১২। আলভা কে ?—একজন বিখ্যাত সেনাপতি।

১৪। ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?
১৬৪৮ খ্রীঃ।

১৫। অজেয় আর্মাডা কাকে বলে ?—এক বিশাল নৌবহরকে।

### পঞ্চম অধ্যায় ॥ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব

১। ক্যাভেলিয়ার বা সওয়ার কে ?
ঘোড়ায় চড়ে যারা লড়াই করতেন, তাদের বলে।

২। পার্লামেণ্টের অন্যতম অঙ্গ কি ?
হাউস অব্ লর্ডস্।

৩। ক্রমওয়েল কে ?—লর্ড প্রটেক্টর।

৪। কমনওয়েলথ কাকে বলে ?
ক্রমওয়েল প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে।

৫। কার রাজত্বকালে টেস্ট অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় ?
চার্লসের রাজত্বকালে।

৬। কত খ্রীষ্টাব্দে বিল অব্ রাইট্স্ পাস হয় ?—১৬৮৯ খ্রীঃ।

৭। ইংলণ্ডে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নাম কি ?
হুইগ এবং টোরী।

### ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ভারতবর্ষ

১। ভারতের মুঘল শাসনের সূচনা করেন কে ?—বাবর।
২। পাঞ্জাবের শাসনকর্তার নাম কি ?—দৌলত খাঁ।
৩। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?—১৫২৬ খ্রীঃ।
৪। খানুয়ার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?—১৫২৭ খ্রীঃ।
৫। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?—১৫৫৬ খ্রীঃ।
৬। মেবারের রাজধানীর নাম কি ?—চিতোর।
৭। শিবাজী কে ?—একজন মারাঠা নেতা।
৮। মুঘলযুগে সাধারণের জীবিকা কি ছিল ?—কৃষি।
৯। মুঘলবংশের শেষ সম্রাট কে ?—ঔরঙ্গজেব।

### সপ্তম অধ্যায় ॥ ভারতের বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

১। আলিনগরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ?
৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ খ্রীঃ।

২। পলাশীর যুদ্ধ কবে হয়?—২৩শে জুন ১৭৫৭ খ্রীঃ।

৩। বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়?—১৭৬৪ খ্রীঃ।

৪। রেগুলেটিং এ্যাক্ট কবে হয়?—১৭৭২ খ্রীঃ।

৫। মাঙ্গালোরের সন্ধির দ্বারা কোন্ যুদ্ধের অবসান ঘটে?
ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ।

৬। লর্ড ডালহৌসী কোন নীতির প্রচলন করেন?
স্বত্ব বিলোপ নীতির।

৭। সিপাহী বিদ্রোহ কত খ্রীষ্টাব্দে কার নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল?
১৮৫৭ খ্রীঃ ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে।

৮। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করে কে?—সিপাহীরা।

৯। হিন্দু পেট্রিয়ট কি?—একটি পত্রিকা।

## অষ্টম অধ্যায় ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ

১। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ হয় কবে?—১৭৮৩ খ্রীঃ।

২। সুগার এ্যাক্ট এবং স্ট্যাম্প এ্যাক্ট কত খ্রীঃ ধার্য হয়?
১৭৬৪ খ্রীঃ এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ।

৩। চার্লস টাউনসেণ্ড কে?—তৎকালীন অর্থমন্ত্রী।

৪। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে গৃহীত হয়?
১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই।

৫। শিল্পবিপ্লব প্রথমে কোথায় শুরু হয়?—ইংলণ্ডে।

৬। ফরাসী বিপ্লব কত খ্রীঃ হয়?—১৭৮৯ খ্রীঃ।

৭। ভলতেয়ার কে?—বিখ্যাত দার্শনিক।

৮। রুশো কি মতবাদ প্রচার করেন?
সামাজিক চুক্তি মতবাদ।

৯। জাতীয় কনভেনশন কত খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়?—১৭৯২ খ্রীঃ।

১০। অষ্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম কি?—ভিয়েনা।

১১। নেপোলিয়ন কোন্ যুদ্ধে পরাজিত হন?
লাইপজিগের যুদ্ধে।

১৫। কোন্ দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হন?—সেন্ট হেলেনার দ্বীপে।

**নবম অধ্যায় ॥ ১৮১৫ সাল থেকে ইউরোপের ইতিহাস**

১। কার্লসবাদ ডিক্রী কি ?—কতকগুলি কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা।

২। ইল রিসরজিমেনতো কি এবং কার লেখা ?

একটি পত্রিকা এবং কাউণ্ড কাভুর লেখা।

৩। নবীন ইটালি কি এবং কে গঠন করেন ?

দল। ম্যাৎসিনি গঠন করেন।

৪। ম্যাৎসিনির মন্ত্রশিষ্য কে ছিলেন ?—গ্যারিবল্ডি।

৫। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?—মেটারনিক।

৬। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোন সোসাইটি স্থাপিত হয় ?

আমেরিকান এন্টিশ্লেভারি সোসাইটি।

৭। মিসেস ষ্টো-এর লেখা বই-এর নাম কি ?

আঙ্কল টমস কেবিন।

৮। কালমার্কস কে ?—একজন জার্মান মণীষী।

**দশম অধ্যায় ॥ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা প্রবাহ।**

১। আফিং যুদ্ধ কার কার সঙ্গে ঘটে ?—ইংরেজদের সঙ্গে চীনের।

২। নানকিং সন্ধির শর্ত কি ছিল ?

চীন বিদেশীদের বসবাস ও বাণিজ্যের জন্য পাঁচটি বন্দর উন্মুক্ত করতে রাজি হল।

৩। লর্টা এ্যারো কি ?—জাহাজের নাম।

৪। চীনের রাজধানীর নাম কি ?—পিকিং।

৫। তাইপিং আন্দোলনের নেতা কে ?—লুং-সিউ-চুয়ান।

৬। তাইপিং কি এবং এর অর্থ কি ?

ধর্মের নাম এবং এর অর্থ পরম শান্তি।

৭। জাইবাৎসু কি ?—জাপানের একটি সংস্থা।

৮। ঈঙ্গ-জাপান চুক্তি কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?—১৯০২ খ্রীঃ।

৯। একুশ দফা দাবি ক' ভাগে বিভক্ত ছিল ?—পাঁচ ভাগে।

**একাদশ অধ্যায় ॥ ব্রিটিশ রাজের অধীনে ভারত ( ১৮৫৮-১৯১৪ )।**

১। প্রথম ভাইসরয় কে ?—লর্ড ক্যানিং।

২। রামমোহন কি কি সংস্কার করেন ?

বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, কন্যাপণ ও কৌলিন্য প্রথা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রভৃতি।

৩। ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতা কে ?

রাজা রামমোহন রায়।

৫। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

দয়ানন্দ সরস্বতী।

**দ্বাদশ অধ্যায় ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।**

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ কি ?

জাতীয়তাবাদের প্রসার।

২। বসনিয়ার রাজধানীর নাম কি ?

সেরাজোভা।

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয় ?

২৮ শে জুলাই, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। এই যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ফল কি ?—জাতীয়তাবাদী নীতির জয়।

**ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ রুশ বিপ্লব**

১। সার্ফ কি ?—ভূমিদাস প্রথা

২। বলশেভিক কি ?—সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

৩। রুশ বিপ্লব কবে হয় ?—১৯১৭ খ্রীঃ।

৪। স্পার্টাকাস আন্দোলন কোথায় দেখা দেয় ?

জার্মানিতে।

**চতুর্দশ অধ্যায় ॥ ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯)**

১। ভার্সাই চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয় ?

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে জুন।

২। নিউলির সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ?

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে।

৩। ইটালীতে ফ্রাসিষ্ট আন্দোলনের নেতা কে?
বেনিটো মুসোলিনী।
৪। রাইম কি?—রাষ্ট্র।
৫। ন্যাৎসী নেতা কে?—হিটলার।
৬। লীগ অফ নেশনস কত খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়?
১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে।

**পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ**

১। কত খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়?
১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে।
এই যুদ্ধে কোন দেশ পরাজিত হয়?—জার্মান ও জাপান।

**ষোড়শ অধ্যায় ॥ ভারতবর্ষ (১৯১৯-১৯৪৭)**

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়?
১৯১৯ খ্রীঃ, এপ্রিল।
২। খলিফা কাকে বলে?—ধর্মগুরুকে বলে।
৩। আরউইন চুক্তি কত খ্রীষ্টাব্দে হয়?—১৯৩১ খ্রীঃ।
৪। আজাদ হিন্দ ফৌজ কে গঠন করেন?
সুভাষচন্দ্র বসু।

**সপ্তদশ অধ্যায় ॥ চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯)**

১। তাঙ্ কে গঠন করেন?—ডঃ সান্ কুয়োমিন
২। চীন জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান কে?
মাও-সে-তুং।
৩। প্রিন্স অফ ওয়েল্স কি?
একটি জাহাজের নাম।
৪। আমেরিকার একটি শহরের নাম কি?
সানফ্রান্সিসকো।